উল্টো দূরবীনে

একটি চতুর্মাসিক চড়ুইপত্র
শরৎ ২০১৩

Ⓡ চিহ্নছাপ লিঙ্গের মহোৎসব দিল্লি থেকে কামদুনি

প্রায় শ'পাঁচেক স্কুলপড়ুয়া, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। হাতে প্লাকার্ড-দাবি : ভান্ডারা কাণ্ডে দোষীদের দ্রুত ধরতে হবে। ওদের শাস্তি চাই। এর প্রেক্ষিত অনেকেরই জানা। গ্রাম: মারমাড়ি, তহশিল : লখনি, জেলা: গোণ্ডিয়া, রাজ্য : মহারাষ্ট্র। ৬, ৯, ১১ বছরের তিন বোন গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ স্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফিরল না। খোঁজ, খোঁজ। পুলিশ প্রথমে গুরুত্ব দিল না, মিডিয়াও তাই। স্বামী হারা জননীকে তিনটি মেয়ে নিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করতে হয় দিন মজুরের কাজ করে। ক্ষুধার জন্যে যার এত লড়াই তাকে তো দমে গেলে চলবে না। খাদ্য অর্থাৎ ধান আর জননী যেখানে একাকার তার প্রসব যন্ত্রণা তো তাকে চালিত করবেই সংগ্রামে; বিশ্বনাথ গরাইয়ের 'জননী' কবিতাটি তারই উদাহরণ ঃ

> আমার গর্ভের আলো তোমাকেই ছুঁয়ে যায় প্রিয়
> আমার গর্ভের আলো ধানের উদ্ভিন্ন দ্যুতি
> একটি ধানের জন্য সভ্যতা, বিপ্লব
> একটি ধানের মতো স্ফুট হোক আমার সন্তান

এই যে ধান তথা খাদ্যের জন্যে সভ্যতা বা বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে কবিতাটিতে সেটাই এই জননী প্রমাণ করেছেন গ্রামের লোকজনদের নিয়ে সড়ক অবরোধে। ঐ তিন বোনের সন্ধান মিলল গ্রামের এক পরিত্যক্ত কুয়ো থেকে। ওদের ধর্ষণের পর খুন করে কুয়োয় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে খুনের কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে যে খাবারের লোভ দেখিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে গিয়েছিল আততায়ীরা। যাদের দুবেলা খাবার জোটে না তারা তো পেটের জ্বালায়, খাবারের লোভে ছুটবেই—অর্থাৎ ক্ষুধা, খাদ্যাভাবের সঙ্গে নিরাপত্তার যে সম্পর্ক সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

> ধান একটি রাজনৈতিক ফসল, তাই এই নিয়ে কথা বলা বারণ।
> ভারতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রজাতির ধান আছে, তাই
> পঞ্চাশ হাজার প্রজাতির রাজনীতি আছে।
> আমি ইদানিং কৃষিজমি নিয়ে কথা বলতে চাই না
> কারণ কৃষিজমি একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র।
> আমরা যারা পুরুষ পরম্পরায় কৃষিজমিতে ধান ও লাঙল চাষ করেছি...
> ... তারা বংশলতা ধরে আপাদমস্তক রাজনৈতিক
> আমরা খিদে ও বিশ্বাসে, লাঙল ও বলদে হাতে হাতে
> দ্রুত পাল্টে যাচ্ছি ... এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ফসল বেচে
> আমাদের খুব লাভ হবে ...

আমাদের আইন আদালত খাদ্যের অধিকারকে জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছে; তা শুধু কথার কথা। সেমিনারে সভায় গলা ফাটালেও, সারবত্তা নেই। ক্ষুধা নিয়ে রাজনীতির কারবারিরা কৃষিজমি, ধানকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে ফসল তোলে তার মুখোশ খোলার কাজটা উপরে উদ্ধৃত কিংশুক মণ্ডলের 'ধান' কবিতায় যে ভাবে ফুটে উঠল তা নিশ্চিত ভাবেই ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে।

অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি

২০১২র ১৬ ডিসেম্বর রাত দশটার সময় দিল্লির মুনিরকা থেকে মহিপালপুর দীর্ঘ ২২ কিলোমিটার পথে প্রায় ফাঁকা বাসের মধ্যে ৫-৭ জনের একটি দল ধর্ষণ করেছিল দেরাদুন থেকে আসা প্যারামেডিকেলের এক ছাত্রীকে। সঙ্গে থাকা তার পুরুষ বন্ধুটি তাকে রক্ষা করতে পারেনি। ছেলেটিকে অকথ্য নির্যাতন করে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। এরপর ভোগের থালায় মেয়েটিকে রেখে কামতাড়িতেরা চালায় সন্ত্রাস এবং ধর্ষণ শিল্পে ডাইমেনসান আনতে যোনিদ্বারে লোহা বা পাথর জাতীয় বস্তু ঢুকিয়ে দিয়ে মৃতপ্রায় ভেবে রাস্তায় ফেলে দেয়। এই ঘটনায় গোটা দিল্লির রাজপথ কেঁপে ওঠে এবং কার্যত গোটা শহরটি বিক্ষোভকারীদের দখলে চলে যায়। জলকামান চালিয়ে কাজ না হলে সরকার নড়ে চড়ে বসে। মেয়েটিকে (দামিনী বা নির্ভয়া : পরিবর্তিত নাম) বিশেষ বিমানে সুচিকিৎসার জন্যে বিদেশের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত ১৩ দিনের মাথায় সে মৃত্যুবরণ করে। এরই প্রেক্ষিতে 'সংসর্গ'র পক্ষ থেকে নারী নির্যাতন বিরোধী সমবেত কলম 'দামিনী' সংকলনটি প্রকাশ পায়। এখানে 'শিল্প' কবিতায় সব্যসাচী দেব লিখলেন ঃ

> আমরা আসিনি মায়ের গর্ভ থেকে
> আমাদের কোন নাড়িছেঁড়া স্মৃতি নেই
> বিষাদ শিখিনি আমরা কখনো কোন
> পোষাকের নিচে উদ্যত শুধু শিশ্ন

কবি এখানে পুরুষ হিসাবে নিজেদেরই ধিক্কার জানিয়ে এই প্রশ্ন করেন। যে যোনিপথকে পাথর ঢুকিয়ে কুলষিত করছি সেই পথ কত পবিত্র এবং পূজ্যশীলার অঙ্গ তা কি কখনও আমরা পুরুষেরা ভেবে দেখেছি, ঐ পথে মায়ের নাড়ি ছিঁড়েই তো এই পৃথিবীর আলো এসে পড়েছিল আমাদের মুখে। সেই সৃষ্টিপথকে আমরা সম্মান জানাবো না? আমরা নিজেরাই নিজেদের ছোট করছি। রমেন আচার্য লিখলেন 'পুরুষ শব্দের গায়ে কাদা ছুড়ে মেরেছি আমিও/পরক্ষণে মুখ লুকিয়েছি।' পুরুষদের দ্বারাই এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হল। এবং কবি নিজে যেহেতু পুরুষ তাই তিনি মনে করছেন এই জঘন্য কাজ, কাদা ছোড়ার দায় আমারই। কিন্তু কবিমনে পরক্ষণেই 'পুরুষ' শব্দটিকে ভেঙে পড়তে দেখে লজ্জায় মুখ লুকান কেননা নিজেও তো সেই পুরুষ। কবি নারী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্ন তোলেন ঃ

নির্ভয়ে কার পাশে হাঁটা যাবে তবে
কার প্রসারিত হাতের ফণায় বিষাক্ত ছোবল?
আতঙ্কিত অবিশ্বাসী মনে ভালোবাসার স্বপ্ন পুড়ে গেলে
থাকে শুধু সাদা-কালো বীভৎস পুরুষ?
হে ঈশ্বর, সবার মুখোশে যেন
প্রবৃত্তির এক্স-রে ছবি ফোটে।

আবার একথাও তো ঠিক সব পুরুষই তো এ সবের জন্যে দায়ী হতে পারে না। যারা সৎ, পরিচ্ছন্ন, সহানুভূতি যাদের আছে, আছে কর্তব্যবোধ তারা কেন এসবের দায়ভার গ্রহণ করবে, পুরুষের প্রতিনিধি হিসাবে আজ কবিকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হলেও অন্যায়কারী হাতটা তো তার নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন 'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন/আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।' কবি সুকল্প চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাশোণিতের অশ্ব' কবিতায় তাই ব্যথার পূজা করতে চান না বরং এদের ক্ষমাহীন আঘাত হানতে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে থুথু-বলয় গড়তে চান:

এ এক স্বাধীন চিতাভস্মের দেশ। মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে
নৈঃশব্দ পুড়ছে। বাইরে ® চিহ্নছাপ লিঙ্গের মহোৎসব।
সূর্যাস্তের করিডোরে ক্ষমাপ্রার্থনারত পুরুষ কবি, মস্তিষ্কের
প্রতিটি রেণু বিক্ষত, চন্দ্রাহত। ধর্ষকদের প্রতিনিধি যেন
তাঁর পৌরুষ। ক্ষমা, কাকে ক্ষমা? যে কব্জি বেআব্রু
করেছিল যে কব্জি হাতে রড তুলে নিয়েছিল তা তো
আমার নয়! দিল্লি, পার্কস্ট্রিট, বারাসতে চিতাভস্মের দেশের
আনাচ কানাচে লকলক করছে অগণিত
বিকলাঙ্গ জিভ, খসে পড়ছে বীর্য। কবি, আপনার
জিভের মদিরা থেকে জন্ম নেয় সকল দুঃখের প্রদীপ। আপনি
ক্ষমাপ্রার্থী? ক্ষমা? কাকে ক্ষমা? বরং শব্দপ্রবাহ
থেমে থাক কিছুক্ষণ, আসুন আমরা গণতান্ত্রিক থুথু
বলয় গড়ে তুলি

এ প্রসঙ্গে আরো একটা জিনিস মনে হচ্ছে, আমরা বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে যা দেখছি সেটা নিয়েই ভাবছি কিন্তু প্রতি নিয়ত সংসারের মধ্যে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপস বা দমবন্ধ করে যে কাজ করে যেতে হয় নারীদের—তা তো কখনোই প্রকাশ পায় না, আমরা স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন কাম ঢেলে দিই, ক্ষমতা দেখাই সেটাও যে ধর্ষণ এটাকে বাংলা কবিতায় চিহ্নিত করছেন কবি সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'মেয়েলি বয়ান' কবিতার মধ্যে ঃ

আমার শরীর কি আশ্চর্য দেখো
ভোর রাতে ফিরতি ট্রাকের ড্রাইভার
দুপুরে গ্লামারাস অফিসের বস্
সন্ধ্যায় সীমান্ত জওয়ান
আর, মাঝরাতে স্বামী ইচ্ছাধীন

কবি এর প্রতিবাদ করে বলেন 'ভোরের রোদ্দুর চেপে আর কত সেঁক নেব। প্রতিদিন, অবিরল, এই ব্যথা মুখে' এবং এই প্রথা চলতে দেওয়া যায় না প্রতিবাদ করতে হবে, মাঝরাত, একদিন দুদিন নয়, প্রতিদিন প্রত্যাঘাত করতে হবে।

রাক্ষস-জিহ্বার জলে কর্দমাক্ত নর্দমা কেবলি
সম্মুখে উলঙ্গ হয়ে আস্ফালন আঁকে ওষ্ঠাধার
হৃদয় নেপথ্যে রেখে/সিকান্দার আবু জাফর

গত ৭ জুন ২০১৩ রাজারহাটের ডিরোজিও কলেজের প্রথম বর্ষের একটি ছাত্রী অপরাজিতাকে (নাম পরিবর্তিত) তার বাড়ি কামদুনিতে ফেরার পথে একা পেয়ে টিপ টিপ বৃষ্টিতে সইফুল আলি নামে এক যুবক অতর্কিতে টেনে নিয়ে যায় পাশের এক পরিত্যক্ত কারখানার মধ্যে। তাকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলেও শান্তি হয় না, ধর্ষণ-শিল্পের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকে তার দলবল নিয়ে এসে। অপরাজিতার দুপা দুদিকে টেনে দড়ি টানাটানি খেলায় মেতে যোনিটা ছিড়ে ফেলে। সংবাদটা শুনে ভীষণ ধাক্কা লেগেছিল। আমার ছেলেও তো ঐ কলেজের ছাত্র ছিল, কলেজে ভর্তি হবার দিন গিয়েওছিলাম ওর সঙ্গে, তাই ভাবছি অপরাজিতা তো আমার মেয়েও হতে পারত। যদিও নিজেকে বাবা বলতে লজ্জা করে। আর, কেন, সেটা জানতে শ্যামল কুমার বিশ্বাসের 'এ-প্রাত্যহিক' কবিতাটি পড়া যাক ঃ

টিভির নিউজফ্ল্যাশ দুশ্চিন্তার কালো মেঘ আনে
অসুস্থ শরীরে, ঘরে, মা-বাবার বক্ষ দুরুদুরু,
অবশেষে ডোরবেল চেনা-ছন্দে স্বস্তি এনে দিলে—
নিয়োগীপাড়ায় রাতে সেদিনের শান্তিঘুম নামে

এ-কোন্ সমাজ আজ সভ্যতার সংজ্ঞা খুন করে?
ঘৃণ্য বর্বরতা, কোথায় পৌঁছলে পর—
আপন জনকও তার শিশুকন্যার দিকে ধায়?

বিকৃত কামনা বিষ আমাদের রক্তে যুগে যুগে
সে কোন্ আইনের ওঝা জাদুবলে এ-বিষ নামাবে?

ঘি ও আগুনের গল্প দিকে দিকে যারা ছড়িয়েছে
তাদের নিরেট মনে কোনোদিন সূর্যোদয় হবে?

উপরে বর্ণিত তিনটি ঘটনাতেই মিলের জায়গা হল স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক আলোড়ন। এবং সংগঠিত প্রতিবাদ এমন জায়গায় পৌঁছায় যাতে রাজনীতির কারবারিরাও ঘাবড়ে যায়। এই কামদুনি কাণ্ডকে ধামাচাপা দিতে সরকার অপরাজিতার ভাইকে চাকরির টোপ দেয়। যেটা আগে দেখা যায়নি এক্ষেত্রে সেটা হল সরকারি চাকরির প্রস্তাবটাকে অপরাজিতার পরিবার থেকে প্রত্যাখান করা; এই প্রত্যাখানের ঘটনা জনজীবনে ভীষণ আলোড়ন তোলে, প্রায় ঐতিহাসিক মর্যাদা পায়। প্রায় দশ দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গেলে অপরাজিতার বন্ধু টুম্পা কয়াল মৌসুমী কয়াল গ্রামের উন্নতি, নিরাপত্তা, পরিবহন ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী 'চোপ' বলে ধমক দিয়ে উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তোলেন। কামদুনি ঘটনার দু'দিন পরেই কবি শঙ্খ ঘোষ সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন : কামদুনির উদ্দীপ্ত প্রতিবাদই আলোর শিখা। তিনি আরো লিখেছিলেন, যে প্রতিবাদী মানুষেরা ক্ষতিপূরণের সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাদের প্রতি রইল আমার প্রণতি। সেই বিবৃতিতে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা প্রচণ্ড উদ্বুদ্ধ হন। তারা শঙ্খ ঘোষের কাছে গিয়ে আলোচনা করে ২১ জুন ২০১৩ তে মহামিছিল করার চেষ্টা করেন। শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, মহাশ্বেতা দেবী, মৃণাল সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন প্রমুখ কলেজ স্কয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিলে পা মিলিয়ে এসপ্লানেডের মেট্রো পর্যন্ত যেতে অনুরোধ করেন। যদিও গোটা কার্যক্রম সফল করতে এ পি ডি আর মুখ্য ভূমিকা নেয়।

ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় প্রতিদিনই চলছে বেপরোয়া নারী নিগ্রহ, ধর্ষণ আর হত্যার তাণ্ডব। দুষ্কৃতীদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা ধরেই নিয়েছে তাদের শাসন করার কেউ নেই, যে কোনও কুকীর্তিরই অধিকার আছে তাদের। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তৈরি হয়ে উঠছে এক আতঙ্কের আবহ। প্রশাসন যদি এখনও এর প্রতিবিধানের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে না পারে, রাজ্য জুড়ে তা হলে দেখা দেবে এক ভয়াবহ বিপর্যয়। শুধু প্রাশাসনিক ব্যবস্থাই নয়, আমরা এও মনে করি যে চারদিকের এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের গড়ে তুলতে হবে প্রবল এবং সংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধ। সমস্ত রকম বিভেদ ভুলে সবাইকে একত্র হয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে আজ, দলীয় রাজনীতির বাইরে এসে স্বতঃস্ফূর্ত যে প্রতিবাদের পথ দেখিয়েছেন কামদুনিরই সাধারণ মানুষ।

বামফ্রন্টের আমলে নন্দীগ্রামের গুলি চালনার, হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ই নভেম্বর ২০০৭ পশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ লেখক, শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা

কলেজ স্কয়ার থেকে মেট্রো পর্যন্ত যে সুবিশাল ঐতিহাসিক মিছিল করেছিল পরিবর্তনের স্বপক্ষে, প্রায় সেই আয়তনেরই মিছিল দেখা গেল গত ২১ জুন ২০১৩ র বিকেলে। যেখানে শ্লোগান উঠল 'সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কামদুনি/ সব শাসকের এক বাণী।' কিংবা 'বন্ধ করে সবার মুখ/স্বৈরাচারের তাতেই সুখ।'

সিপিএমের আমলে, যারা আকাদেমি-রবীন্দ্রসদন ভোগ করছিলেন তারা নন্দীগ্রামের প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেননি, সহমর্মিতাও প্রকাশ করেননি, আবার তৃণমূলের সরকারের আমলে রবীন্দ্র সদন আকাদেমির মালের ভাগ যারা পাচ্ছেন অনুরূপভাবে তারাও এই মিছিলে অনুপস্থিত। হয়তো ভাবছে ৩৪ বছর ধরে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট যা করেছে সেখানে তৃণমূলকে খাওয়ার জন্যে কমসেকম ১০ বছর সময় তো মানুষ দেবে। না দিলে তো ঐ হার্মাদরাই আবার আসবে। তৃতীয় কোন শক্তি নেই। কিছুদিন আরামসে চলুক না।

২১ জুন ২০১৩র মিছিলে দেখা গেল 'সুঁটিয়া ধর্ষণ বিরোধী প্রতিবাদ মঞ্চ'-কেও, টেম্পু ভাড়া করে তারা এসেছিলেন কামদুনির ঘটনার প্রতিবাদে আয়োজিত মিছিলে। তাদের শ্লোগান : 'কামদুনি আর সুঁটিয়া আলাদা কোথায়? সেই ধর্ষণ, সেই চোখরাঙানি, সেই দলমত নির্বিশেষে নেতাদের নিস্পৃহ হয়ে যাওয়া'। মনে পড়ছে এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বরুণ বিশ্বাসকে, তার অতি উজ্জ্বল চোখ দুটো বড় আকর্ষণ করে। সমাজ নিয়ে ভাবতে তাড়া করে, নির্ভীক হতে সাহস যোগায়। সে বলেছিল ঃ

যদি এখনও মা বোনেদের সম্মান রক্ষা করতে না পারি,
তাহলে আমরা সভ্য সমাজে থাকার যোগ্য নই।

এই বরুণ সুঁটিয়ার মস্তান সুশান্ত চৌধুরী ও তার দলবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামবাসীদের কথায় শোনা, সুশান্ত বলত, 'এলাকার কোন মেয়েটাকে ভাল লাগছে বল, তুলে আন, চুটিয়ে ভোগ কর। বাকিটা আমি সামলে দেব।' কেননা আগের সরকারের আশীর্বাদ তার মাথার উপরে। ঘটনাচক্রে ফ্লাড সেন্টার তৈরির সময় সরকার নিযুক্ত ঠিকাদারের কাছে তোলা আদায় করতে গিয়ে গন্ডগোল বাধে। বামফ্রন্ট সরকার চাপে পড়ে সুশান্তকে জেলে পাঠায়। সুঁটিয়া গণধর্ষণ মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী ছিলেন বরুণ বিশ্বাস, তাই তার খুন হবার আশংকা ছিল। সুঁটিয়ার মানুষের ধারণা তার উপর সমাজ বিরোধীদের রাগ শুধু গণধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য দেবার জন্যে নয়, ইছামতী-যমুনা নদীর গতিরোধ করে এলাকায় ইটভাটা ও ভেড়ি ব্যবসা করে যারা টাকা লুটত তাদেরও টার্গেট হয়ে গিয়েছিল বরুণ। ঐ ইটভাটা ও ভেড়ি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজনৈতিক কারবারিদের টাই আপে প্রতিবছরই বন্যা হত সুঁটিয়াতে। বরুণ নদী-খাল সংস্কার আন্দোলনেও নেমেছিলেন। ফলে ওদের স্বার্থে ঘা লেগেছিল। ইচ্ছে করলে বরুণ নিরাপদে থাকত, সুঁটিয়া থেকে মোটর সাইকেলে গোবরডাঙ্গায় এসে বনগাঁ লোকালে শিয়ালদায় পৌঁছে মিত্র ইনসটিটিউসানে (মেন) গিয়ে বাংলা পড়াতে যাবার দরকার হত না, কলকাতাতেই থাকতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। বরুণ হেসে বলত ঃ আমি হলাম অনেকটা কামুর 'দ্য প্লেগ'-এর নায়ক। সে জানে, প্লেগে ভরা প্যারিসে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। তবু পালাতে পারছে না, কারণ সে এটাও জানে, চলে গেলে এই ধুঁকতে থাকা, দিশেহারা, অসুস্থ মানুষগুলোর আর কোনও ভরসা নেই। সুঁটিয়ার দরকার আছে আমাকে। সেই নায়ক প্লেগেই মারা গিয়েছিলেন, আর বরুণ গুলিতে, ঠিক এক বছর আগে, জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে, ২০১২য়। সন্ধের ট্রেনে অফিস থেকে ফিরছেন। গোবরডাঙা স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্ম-ঘেঁষা টিকিট কাউন্টারের সামনে মোটর সাইকেলটা ছিল। ওঠার পরেই পিছন থেকে একটা গুলি। প্রায় আধঘন্টা রক্তে মাখামাখি হয়ে কাতরেছেন। কেউ এগিয়ে আসেনি। প্রায় দু'ঘন্টা পর যখন বারাসত হাসপাতালে ঢোকানো হচ্ছে, ট্রলিতেই ৩৯ বছরের লড়াকু জীবন শেষ।

বিশ্বাস হারানো পাপ?/পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়
আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ জুলাই ২০১৩

এতক্ষণ ধর্ষণ-হত্যা বিষয়ে যে সব ঘটনা তুলে ধরলাম তার কারণটা কী সেটা তো খুঁজে বের করতে হবে। তবে কারণ একাধিক এবং যথেষ্ট জটিলও বটে। প্রথমত শাসক-শোষিতের রাজনীতির ফলে একটা অস্থিরতা, অসামাজিক কার্যকলাপ, দুর্নীতি, শৈশব থেকে বঞ্চনা, অশিক্ষা, ফলে হিংসাশ্রয়। এরপর খুনরাহাজানিতে লেটার পেলে রাজনৈতিক নেতাদের নজর কাড়ে। হাতে কাঁচা পয়সা এসে যায়। সে তখন পানশালায় যেতে পারে। বাইক কিনতে পারে। কিন্তু শিক্ষিত কোন মেয়ের সাথে মেহফিল করতে গেলে ব্যর্থ হতেই পারে। হেরে যাওয়ার হতাশা থেকে রোখ চেপে গেলে অবধারিত ধর্ষণ এবং পিসফুলি হাপিস। অবশ্য এর বিপরীতও আছে। আমিনুল ইসলাম, সেও তো একজন পুরুষ যে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়েয়া থানার সামনে নিজের গায়ে আগুন ধরায়। ফলে হতাশ না হয়ে এই রকম পুরুষের হাত ধরেই প্রতিবাদ করতে হবে। সুঁটিয়ার ধর্ষিতাদের সাহস জুগিয়ে ১৮ গাড়ির কনভয় নিয়ে এসডিও অফিসে ডেপুটেশনের নেতৃত্ব তো একজন পুরুষ বরুণ বিশ্বাসই দিয়েছিল। রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যদের নিয়ে আসা, নিয়মিত ধর্ষিতাদের কাউন্সেলিং করানো, তার চেষ্টাতেই তো ধর্ষিতারা এগিয়ে এসে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ফলে এক বরুণ চলে গেলেও আর এক বরুণ এসে নিশ্চয়ই হাত ধরবে, এই বিশ্বাস আমাদের রাখতে হবে। সেই জন্যেই এ সমাজে বরুণই নায়ক, তাকে নিয়ে নাটক, তাকে নিয়ে তো সিনেমা হবেই। তাকে নিয়েই তো লেখা হচ্ছে প্রাণের কবিতা। বরুণের বাড়ির কাছে থাকে কবি রণজিৎ হালদার, ওর কবিতাটাই এখানে তুলে দিলাম। এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে ও-ইপ্রথম কবিতা লেখে, ওর কবিতা পড়েই আমাদের রক্ত চলাচল বেড়ে গিয়েছিল :

৭ জুলাই, ২০১২ শনিবার
ইতিহাস আরেকবার কালি ঝেড়ে ফেল্ল
বরুণ বিশ্বাসের রক্তে লেখা হলো
বিপ্লব কখনো মরে না, মারতে পারে না কেউ
'চিরন্তন সত্যের নিঃশ্বাস' আমি তো দেখিয়াছি
দেখেছি সংগ্রামের কলজে গুলিবিদ্ধ হলে
প্রতিটি লোমকূপ থেকে আমার ফিন্‌কি দিয়ে ছোটে বরুণ বিশ্বাস।

বরুণ বিশ্বাস মানে—প্রতিবাদের সুর
বরুণ বিশ্বাস মানে—মফস্বলের পায়ে-পায়ে
নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের অপরাজেয় ঘোড়ার ক্ষুর।
বরুণ বিশ্বাস মানে—সংগ্রামের বন্ধ দুয়ারে ঝুলন্ত তালার চাবি
বরুণ বিশ্বাসের রক্ত মানে আমার রক্ত ফুচ্‌কাওয়ালার দাবি।

গোবরের নীরব জরায়ু ফেটে যদি গোলাপ কিম্বা সূর্যমুখী ফোটে
তাহলে তো ভানুদির যৌনাঙ্গে গাঁজার কলকের স্যাঁকায়
লক্ষ বরুণদার জন্ম হতেই পারে।
ভানুদির যৌনাঙ্গে গাঁজার কল্‌কের স্যাঁকা মানে
কলমের টুঁটি চেপে ধরে কবিতার জন্ম রোধ করা
আর কবিতার জন্ম রোধ করা মানে কবির বিবেক পৃষ্ঠায়
পেরেক পুঁতে এ বিশ্বকে বধ্যভূমিতে পরিণত করা।

বরুণ বিশ্বাস
কবিতার পৃষ্ঠায় ভানুদির হাতের দিগন্ত তৈরির ফাগ্‌
বরুণ বিশ্বাস
কবিতার পৃষ্ঠায় ফুচকাওয়ালার মুখনিঃসৃত
অনন্ত-ভবিষ্যতের একটি চিরস্থায়ী দাগ।

শাহবাগ চত্বরে প্রজন্মের রোদ

কদিন ধরে কাগজে টিভিতে লক্ষ করছিলাম শাহবাগ প্রজন্ম চত্বর। লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত। ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩। আন্দোলনকারীরা ভেবেছিল আজকের রায়ে কাদের মোল্লার ফাঁসি হবে। যে কাদের ৩৪৪ জনকে খুন করেছে। সে মানবতা বিরোধী নিষ্ঠুর অপরাধী, ফাঁসির পরিবর্তে তার যাবজ্জীবন সাজার রায়ে নারী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ সবাই ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মোমবাতি জ্বালিয়ে আশ্চর্য প্রতিবাদ পালন করল বাংলাদেশের মানুষ। 'ব্লগার অ্যান্ড অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক'-এর ব্যানারে সেই ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে, গোটা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখল তাদের সংহতি, তাদের নিষ্ঠা, তাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা। ঐ জমায়েতে এক মহিলার প্লাকার্ড উর্ধে শোভা পাচ্ছিল। ছবিটা যে কার তা বুঝতে পারছিলাম না, বুঝবই বা কি করে, বাংলাদেশের খোঁজ খবর তো আর রাখি না। যা ভেবেছিলাম তা যখন হল না তখন ও দেশের কথা ভেবে আর কি হবে? এর মধ্যে সত্যিই হয়তো একটা অভিমান আছে, তার প্রকাশ দেখলাম 'শাহবাগ' নিয়ে লেখা গোপাল মল্লিকের 'কান্দো নদী কান্দো' কবিতাতেও ঃ

যে দেশটা একদিন আমাগো ছিল
যে দেশটা আর কুনোদিন হইব না আমাগো
দূর থিক্যা সে দেশের নদীমানষেরে জানাই সালাম
সে দেশের পথ-প্রান্তর বাগবাগিচারে সালাম

যে দেশ আমার মুখে তুলে দেয়নি তেষ্টার পানি
যে দেশ আমারে খাওয়ায় নাই এক ফোঁডাও বুকের দুধ
যে দেশ জন্মইস্তক কোলছাড়া করছে আমারে
যে দেশ এখন শুধুই কাঁটাতারের বেড়া—

জানি না, সে দ্যাশটার লাইগ্যা ক্যান
আমার বুকের মধ্যে কান্দে এক নদী...

মনে পড়ে 'আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করোনা, সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবানা'। মুজিবর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, তখন তো টিভি ছিল না রেডিওতে বাজত 'শোন একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠে' এই গান গেয়ে অংশুমান রায় রাতারাতি বিখ্যাত; কী সেদিনের উন্মাদনা স্বাধীন বাংলাদেশ দেখব! বর্ডার খুলে গেল, বিধিনিষেধ নেই, বন্ধুরা দল বেঁধে বনগাঁ থেকে সকালে একটা বাসে চলে গেলাম খুলনা। সেখানে নদীর ধারে বাজার, হোটেল। দুপুরে টাটকা ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম। ফেরার সময় মাত্র ৫ টাকা দিয়ে এক কেজির বেশি হবে একটা ভেটকি মাছ নিয়ে এসেছিলাম। তখন আমরা বনগাঁয় থাকি। রাত্রিবেলায় ফিরে এলাম। মাছ দেখে তো মা খুব খুশি, ভাই বোনেরাও উজ্জ্বল! চটপট কেটে মাছের ঝোল তৈরি হল, খেতে খেতে মায়ের গল্প : আমরা মাদারীপুর সাবডিভিসনের কাশিয়ানিতে থাকতাম মধুমতী নদীর তীরে। কত মাছ; যদি দেখাতে পারতাম। পরক্ষণেই মুখ অন্ধকার! বোরখা ঢেকে রাতের অন্ধকারে সহৃদয় মুসলমানেরাই আমাদের বর্ডার পার করে দিয়েছিল। তারপর কলকাতায় আশ্রয়ের জন্য ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়ানো।

আবার অন্য মতও আছে। শ্রমজীবী ভাষা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তে প্রকাশিত দীপক পিপলাইয়ের 'আমার প্রশ্নভূমিঃ বাংলাদেশ' পড়ে জানতে পারলাম বরিশালে ওদের বাড়ি যারা কিনেছেন, ৬২ বছর পরে আজও 'আপনাগো বাড়ি' বলে সনাক্ত করে। অনির্বচনীয় আতিথেয়তায় অবাক করে তাদের আত্মীয় বলে ভাবেন। বাঙালি মুসলিমরা বাংলাভাষাকে যে মর্যাদা দিতে পেরেছেন, বাঙালি হিন্দুরা তা পারেননি এবং পারছেন না কেন? তা বলতে গিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২ তে লেখা কবি বিমল চন্দ্র ঘোষের 'শহীদ বাংলা' কবিতাটির উল্লেখ করেছেন :

বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করে গেল যারা
কাব্যের শহীদ নয় তারা
হে ব্যাঘ্রবাহিনী বাংলা বাঙালীত্ব প্রতিষ্ঠার তরে
সেই ব্যাঘ্রশিশুদের তাজারক্ত ঝরে।
তোমার শ্যামলী অঙ্গে অগ্নিপদ্ম পারা
হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে কাঁপে লৌহকারা।
ওরা নয় সামান্য শহীদ
ওদের কঙ্কালে আজ রচিত হয়েছে পাকা ভিত
অনাগত অভ্রভেদী সৌধ প্রগতির
শান্তিবাদী সাম্যবাদী বিংশশতাব্দীর।
ওরাই মুক্তির দূত বাঙালী জাতির ভয়ত্রাতা
বাঙালী মুসলিম ওরা বাঙালী হিন্দুর মুক্তিদাতা।।

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ভাল থাকার ইচ্ছায় তার পিতৃকুল, মাতৃকুল দেশভাগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ না করে নিঃশব্দে দেশত্যাগ করে। তারা হয়তো পারিবারিক বিচারে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু সামাজিক বিচারে ঠিক কাজ করেছেন কি? দাঙ্গা গণহত্যা সত্ত্বেও হিন্দু প্রধান দেশে বাঙালি মুসলিমদের বাস করাটাই যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে মুসলিম প্রধান দেশে বাঙালি হিন্দুদের পক্ষে চোদ্দপুরুষের ভিটেতে থেকে যাওয়া সম্ভব নয় কেন?

এবিতর্ক চলতেই থাকবে কেননা একই পরিবারের মধ্যে রয়েছে ভিন্নমত। আবার দেশভাগের ফলেই যেহেতু ভুগতে হচ্ছে মানুষকে জোতির্ময় মণ্ডলের উপন্যাস 'সুখচাঁদ' এ ভারত দেশটাতে কেন তাদের অধিকার থাকবে না উঠেছে সেই প্রশ্ন। উপন্যাসের নায়ক সুখচাঁদ ও তার বাবা গয়ালীর কথোপকথন লক্ষ্য করা যেতে পারেঃ

গয়ালী সুখচাঁদের দিকে এগিয়ে যায়। আগ বাড়িয়ে ডাকে।
—সুখচান্দ, এট্টু খাড়াইয়া যা দিকি? কয়ডা কতা আছিল।
—ক-ও।
সুখচাঁদের গলাটা কেমন অস্বাভাবিক লাগে গয়ালীর কাছে।
—ঢাহায় গেছিলি ক্যান্‌বা?
—হুইনা কী কাম? জিগাও ক্যান?
—কাম আছে। তুই আগে ক-অ, ক্যান্ গেছিলি?
সুখচাঁদ ছট্‌ফট্ করে এই প্রশ্নের মুখে।
—কী অইল? কতা কস্‌না ক্যান?
—তুমি আমারে ভুল বুইজোনা বাবায়!
—ভুল বুজুম ক্যান্। ক-অ না তুই।
—ছারপত্তর কইরতে গেছিলাম গিয়া। কইরাও আনছি। এ দ্যাশ ছাইরা দিমু। ও দ্যাশে হুনছি মেলাই সুবিধা। তোমার নাতিডা লেখাপড়া শিখা মানুষ অইবার পারবে। মুই চাকরিও পামু। সরকারেই বিধিবস্তটা কইরবে তো কয়। তাছাড়া এদ্যাশের যা হালচাল তেহা যায় তাতে না 'জানে' মইরা যাই কোনও কালে! ঘরবারি পুইরতে কতক্ষণে!
—চুপ মারবি তুই! তোর অই আট-ফাটাঙা কতার কোন দাম আছেনি?
—ক্যান চুপ অমু, ক্যান্ কও তো? ও-ও দ্যাশ কি আমাগো দ্যাশ নয় বাবায়? শিক্ষিত ছেলের মুখে শিক্ষিত কথা!
গয়ালীর মুখে বরাবর কে যেন এক চড় মারে হঠাৎ। মুখ চোখ লাল হয়ে আসে। চোখের মণিতে জল টল্‌টল্ করে। সে বিড়বিড় করে আপন মনে।
—তবুও জম্‌মো ভিটা। মা বাপের ঠাঁইরে সুখচান্দ!

এবার ফিরে আসা যাক পূর্বপাকিস্থান থেকে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশপর্বে। নতুন বাংলাদেশ শুরু থেকেই একটা বিশৃংখলার মধ্যে দিয়ে চলছিল। এপারে কান পাতলেই, মুজিবের ছেলে খুব বাড়াবাড়ি করছে। দুর্নীতি, অত্যাচার নানা কাণ্ডে

জড়িত। এই সুযোগে মেজর ডালিম ও অন্য সামরিক অফিসাররা চক্রান্ত করে মুজিবকে হত্যা করল তার ধানমন্ডির বাড়িতে। ব্যস, এবার আরো বারোটা বাজল, এল সামরিক প্রশাসক জিয়াউর রহমান (১৯৭৮-৮২)। তারপর তাকেও হত্যা করা হল সামরিক চক্রান্তে। এবার রাষ্ট্রপতি হলেন এরশাদ। এও একজন সামরিক প্রশাসক। মুজিবের মৃত্যুর পরপরই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কেননা তখন থেকেই মধ্য এশিয়ায় মুসলিম দেশগুলোর সাথে সরকারি ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। বাংলাদেশের ছেলেরা দলে দলে আরব দেশে পাড়ি দিল কাজের ধান্দায়, সঙ্গে নিয়ে এল ওয়াহাবি আদর্শ যা মৌলবাদের ভিত্তি পাকাপাকি স্থাপন করল। এরশাদ ১৯৮৮ তে বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন। এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার কিরকম হয়েছে একটু দেখে নেওয়া যাক। ১৯৭৫ এ জিয়াউর রহমান যখন কুৎদেতার মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসেন তার আগে বাংলাদেশে মাত্র ১,৯৭৬ টি মাদ্রাসা ছিল যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৭৫,০০০। এরপর ২০০২ সালে মাদ্রাসার সংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫,৬৬১ যার ছাত্রসংখ্যা ২৮,২৪,৬৭২। শুধু তাই নয় সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান তারপর এরশাদ এদের উৎসাহে রমরমা বাড়ে বেসরকারি কাওমি মাদ্রাসার যার সংখ্যা ১৫,০০০। ছাত্র সংখ্যা আনুমানিক ২০ লক্ষেরও বেশি।

সূত্রঃ ইন সার্চ অব অ্যান আইডেনটিটি ঃ দি রাইজ অব পলিটিকাল ইসলাম অ্যান্ড বাংলাদেশি ন্যাশনালিজিম। লমিয়া করিম। কৃতজ্ঞতা : মন্থন মার্চ, এপ্রিল ২০১৩।

কিন্তু কৌশল করে বাংলার ঐতিহ্যকে ঢেকে রাখা যাবে না। তার প্রকাশ তো একদিন ঘটবেই যা ঘটেছে শহবাগে। মনে করতে পারি। পাকিস্তান জন্মের শুরু থেকেই বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানবাদী আরবীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘর্ষই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ তৈরির প্রথম সোপান। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ জানত বাঙালির অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি ধ্বংসের জন্যেই রবীন্দ্রসংগীতকে নিষিদ্ধ করে। তাতে ভালই হয়, একটা জাতি জীবন দিয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, তাইতো সবাই যায় ঢাকার শহীদ মিনারে বাংলা একাডেমির খোলা চত্বরে যেখানে রয়েছে বেদীর উপরে আবক্ষ মূর্তি পাঁচ শহীদের ঃ আবুল বরকত, রফিকউদ্দিন আহমদ, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান এবং আবদুস সালাম-এদের শ্রদ্ধা জানায়, প্রণাম করে। ১৯৫২'র ২১ শে ফেব্রুয়ারি এখানেই তো পাকিস্তান পুলিশের বর্বরোচিত গুলিবর্ষণের ফলে এদের মৃত্যু হয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনাতে কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করেনি। বাংলাদেশই একমাত্র উদাহরণ। তাই UNESCO ১৯৯৯ এর নভেম্বরে ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে গ্রহণ করেছে। কেননা ঃ 'দেশের সোনার ছেলে খুন করে রেখে মানুষের দাবি/দিনবদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?/না, না, না, না, খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই/ একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী'। কবিতাটা একজায়গায় পড়েছি কার যে লেখা তা জানতে পারিনি। পরবর্তীকালে সত্তরের দশকে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় উঠে আসে শহীদদের প্রতি তর্পণ এবং সেখান থেকে তার অন্তরাত্মা শক্তি সঞ্চয় করে, হৃদয়ে জাগে অমর হবার বাসনা ঃ

এই দেখো অন্তরাত্মা মৃত্যুর গরবে ভরপুর,
ভোরের শেফালি হয়ে পড়ে আছে ঘাসে।
আকন্দ-ধুন্ধুল নয়, রফিক-সালাম-বরকত-আমি —
আমার আত্মার প্রতিভাসে
এই দেখো আগ্নেয়াস্ত্র, কোমরে কার্তুজ,
অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্রোহ,
উদ্ধত কপাল জুড়ে যুদ্ধের এ রক্তজয়টিকা।
আমার কিসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে দাও।

ফলে সেই কষ্টে পাওয়া অধিকার সেই 'জয়বাংলা' ডাক কে মুছে দেবে? রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন 'ছায়নট' এর শিক্ষিকাদের নামও উঠে আসে মৌলবাদীদের হিটলিস্টে, তাদের অনুষ্ঠানে ঘটে বোমা বিস্ফোরণ। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করলে ১৯৬৮ তে মাত্র ২০ বছর বয়সেই তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বাংলাদেশের মেয়ে লুৎপান্নাহার হেলেন। তার ডায়রি তো পড়েছে এই শাহবাগের প্রজন্ম। এই হেলেন মুক্তি যুদ্ধে যোগ দিলে রাজাকাররা তাকে ধরিয়ে দেয় পাকসেনাদের হাতে। তাকে ধর্ষণ করে, হত্যা করে তার মৃতদেহ জিপের পেছনে দড়ি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে শহরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে ফেলে দেয় নবগঙ্গার ডাইভারশন ক্যানেলে।

আজকের নতুন প্রজন্ম অতীতের স্মৃতি ভোলেনি। তারা বুঝেছে ধর্মান্ধদের হাতে পড়ে দেশ একদিন তালিবানি আফগানিস্থান তৈরি হবে। ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর থাকবে না। ব্যাহত হবে নারীশিক্ষা। ২০১২-র ৯ অক্টোবর স্কুলে যাবার পথে তালিবানরা পাকিস্তানের অগ্নিকন্যা মালালা ইউসফজাইকে গুলি করেছিল। পাকিস্তানের সোয়াট প্রদেশে মেয়েদের স্কুলে-কলেজে যাওয়ার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছিল তালিবানরা। সেই ফতোয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওই তালিব-অধ্যুষিত অঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রসারে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলে পাক কিশোরী মালালা। শাস্তি হিসাবে স্কুল বাসে উঠে মালালার মাথায় ও ঘাড়ে গুলি করে এক জঙ্গি। ইংল্যান্ডে তার অস্ত্রোপচার হয়। এখন সে বাবার সঙ্গে বার্মিংহামে আছে। সারা বিশ্বে শিক্ষা আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে সে। কাগজে দেখলাম, রাষ্ট্রপুঞ্জ আগেই ঘোষণা করেছিল মালালার জন্মদিন ১২ই জুলাই 'মালালা দিবস' পালন করার। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে যুব অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান-কি-মুন এবং প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন, মালালার গায়ে এ দিন ছিল প্রয়াত পাক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর শাল। এই সম্মান নিশ্চয়ই তাকে আরো সাহস যোগাবে এগিয়ে যাবার। শিক্ষা বিস্তারের আকুতি ছিল তার ভাষণেঃ

> 'তালিবানরা ভেবেছিল বুলেট দিয়ে আমাদের চুপ করানো যাবে। কিন্তু ওরা ব্যর্থ। নীরবতা ভেঙে জেগে উঠছে হাজার কণ্ঠ।'
>
> 'কলম তলোয়ারের চেয়েও শক্তিশালী। মৌলবাদীরা শিক্ষাকে ভয় পায়। সমতার আদর্শ সমাজকে বদলে দিতে পারে, মৌলবাদীরা ভয় পায় তাকেও।'

আবারও বলব শাহবাগের তরুণরা অতীতকে ভোলেনি, তাদের হাতে ইন্টার নেট। সেখানেই চলে তাদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা। তারা ভাল করে জানে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা, মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকরা ১৯৯০-এরশাদ শাসনের পতনের পর সংগঠিত করে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাতাবরণ' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ এই দুই যৌথ কমিটির আহ্বায়ক শহিদ জননী জাহানারা ইমাম গণআদালতে এইসব ষড়যন্ত্রকারী ও মৌলবাদীদের ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেন 'এই সব স্বাধীনতা শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের খুব বেশি মাত্রায় সচেতন হতে হবে। এখনই সময় এদের শেষ করার। যদি না পারি তবে ভবিষ্যতে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব'। লেখার শুরুতে বলেছিলাম শাহবাগের মিছিলে যে মহিলার ছবি সম্বলিত প্লাকার্ড ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ছিল, জানতাম না, পরে জানলাম সেই মহীয়সী নারীই জাহানারা ইমাম।

শাহবাগের আন্দোলনের দাবীগুলিতে রয়েছে দেশের সুস্থ সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, রাজনীতির বিশুদ্ধকরণ এবং সমাজ কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন। বাংলাদেশকে বাঙালিদের দেশ হিসাবে দেখতে চায় আজকের প্রজন্ম। শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে তাই উচ্চারিত হয় 'ধর্ম যার যার দেশ সবার'। জহানারা ইমাম যে ধ্বংসের কথা বলেছিলেন সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করতেই ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কবি জহিদ হায়দার লেখেনঃ

আমি দেখি হাতে সূর্যবীজ, শত শত মুখ
দেখি সত্তার জীবন্ত নদী, বহমান একাত্তর

এই তরুণ প্রজন্ম ধর্মের ধ্বজা হাতে যারা গণহত্যা করেছে তাদের ফাঁসি চায়। আবেগের দৃষ্টিতে দেখলে বলব শাহবাগের ভাবধারা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯ মে ভাষা আন্দোলন-বাংলাভাষার জয় হোক এই ভাবধারা, রামকৃষ্ণ-লালন-ভবাপাগলা-হাসনরাজার সমন্বয়ী চেতনার ভাবধারা। সেই উজ্জ্বল ঐতিহ্যের বাংলাকে পুনরাবিষ্কারের ভাবধারা। বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন 'এখনো বিষের পেয়ালা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়নি, তুমি কথা বলো!' আর একথা বলাতেই মৌলবাদীরা সুদূর জার্মানিতে গিয়ে তাকে খুন করে। তারই উত্তরসূরী শাহবাগ আন্দোলনের ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন কদিন আগে ঢাকাতে আততায়ীদের হাতে প্রায় খুন হয়েও বেঁচে যান। তারপরে রাজীব হায়দারকে আন্দোলন চলাকালীন খুন করে। এই মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশ তোলপাড় হয়ে যায়। প্রত্যাঘাত যতই আসুক, ধর্মান্ধ রাতের, ক্ষুদ্রের আস্ফালন ব্যর্থ করে সমষ্টি। এপারে তার প্রতিক্রিয়ায় কবি অংশুমান কর লেখেন ঃ

মরেছে কিন্তু মানেনি তো পরাজয়
একটি স্বপ্ন লক্ষ রাজীব হয়ে
উঠে দাঁড়িয়েছে ভেঙে সব বাধা, ভয়–
ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়

দোহার গ্রুপের কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য তার গানের মধ্যে দিয়ে শাহবাগ আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানালে দ্রুত সেই গান ইউ টিউবের মধ্যে দিয়ে গিয়ে শাহবাগ আন্দোলনে বাজতে থাকেঃ

'একুশের মাসে বসন্ত আসে, এবার এসেছে সংগ্রাম
সারা বাংলায় শাহবাগ আজ, শাহবাগ বাংলার নাম'...

কবি বিভাস রায়চৌধুরীর 'শাহবাগের জন্য গান' এ ধর্ষিতা লক্ষ লক্ষ মা বোনেদের স্মৃতি, জমানো কান্নার ইতিহাস। অন্তর্খননে সাদা হাড়গুলো উঠে এসে বড় আক্রান্ত করে। কবিতায় শিমুল পলাশের রক্তবরণ চিৎকারের ধ্বনি যেন জমা রাগের বহিঃপ্রকাশ যা বিদ্রোহের ইন্ধন রূপে প্রতীকায়িতঃ

কান্নার আছে আউল-বাউল বাঙালির ইতিহাস
মাটি খুঁড়লেই উঠে আসে শত ন্যাংটো মায়ের লাশ...

লাশ জানি আজ লাশ নেই, ওগো, পড়ে আছে কিছু হাড়।
গাছে গাছে যত শিমুল-পলাশ জুড়ে দেয় চিৎকার...

চিৎকার শুনে নতুন বাংলা জমা করে সব রাগ...
আগুনে-আগুনে রঙিন হয়েছে বিদ্রোহী শাহবাগ!

যে তরুণ সম্প্রদায়কে আমরা ভাবতাম স্বার্থপর, উদাসীন ভোগবাদী সমাজের প্রলোভন দ্বারা আক্রান্ত সেই প্রজন্মই যখন এগিয়ে আসে তখন মনে হয় যুদ্ধ পরবর্ত্তী প্রজন্মকেই বেশী টানে যুদ্ধের স্মৃতি। কোন মন্ত্রবলে জানিনা বাড়ির বউ তার কোলে বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে শাহবাগে। রিক্সাওয়ালা 'শাহবাগ' গেলে ভাড়া নাকি নেয়নি অনেকের কাছে। কেউ পিঠে মুড়ি চিড়ে নিয়ে এসে বিলি করছে। সব থেকে অবাক করেছে মেয়েদের পার্টিসিপেশান। লাকি আক্তার নামে মেয়েটি তো শ্লোগানকন্যা হয়ে উঠল। সে মাইক্রোফোনে এক নাগাড়ে স্লোগান দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে শুশ্রূষায় ভাল হলে আবার শাহবাগে ফিরে আসে। ঠিক সেই তেজ দেখলাম শেলী নাজের কবিতায়। যেন ছোবল মারছে! ওর 'নিরস্ত্র শাড়ি' কবিতাটা এখানে তুলে দিলাম ঃ

নিরস্ত্র শাড়িতে লেগে গেছে বসন্তের রক্তস্রোত
অন্ধ এ জোয়ার আজ খুনের উল্লাসে ফুঁসছে শিরায়
আঁচলে গর্জন, মাংসের মিনারে রায় লিখে দিচ্ছে মৃত্যুদূত
নিদ্রাহীন শিবির থেকে ছুটছি ভোরের মোহনায়
ফাঁসি ফাঁসি বলে খান খান হচ্ছে অগ্নিস্নাত আমার হৃদয়
শব্দে প্রকম্পিত প্রাসাদ ও পথ, জোট বেঁধে ঘন হচ্ছে ওম
ও শ্বাপদ, ও হায়েনা জেনে রাখ্ কোনো শিখা ঘরে ফিরবে না
অযুত স্ফুলিঙ্গ নিয়ে অপেক্ষারত বারুদগন্ধী আমার কুসুম

বাহু প্রসারিত, কণ্ঠ উচ্চকিত, বৃত্ত বড় হচ্ছে প্রতিদিন
স্তব্ধতাও চিৎকার শিখে গেছে, এইতো সময়
এ বসন্তে জাগ্রত চিতার পাশে তর্জনী আকাশলীন
বাসন্তী শাড়ির মনে খুন, হোলি রঙে প্রাণান্তিক বরাভয়

সহস্র সাপের ফণা ঝাঁপিতে আমার, জ্বলছে সবুজ চোখ
যদি তোমাদের রজ্জুর অভাব, আমার শাড়িতে তার ফাঁসি হোক।

অনেকে বলছেন এপার বাংলায় বসে এসব নিয়ে কাব্য করে কী হবে। শাহবাগ আন্দোলন যাতে ঠিক পথে এগোয় তা যুক্তির মাধ্যমে আত্মসমালোচনা করে সঠিক দিশা দেখাতে হবে। যাতে ভুল পথে পরিচালিত হয়ে দ্রুত ফুরিয়ে না যায় না। আবেগকে অনুশাসন দিয়ে বাঁধতে হবে তো। আবেগ না থাকলে কবিতা লেখা যায়না, আবেগ জ্বালানি, আবেগ ইন্ধন, মন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে যেমন ঈশ্বরের সাথে একাত্মতার অনুভূতি জাগে, তেমনি কবিতা লিখে কবি ঘটনার হৃৎস্পন্দন অনুভব করেন। তাই একে বাদ দেবার কথা বললে কেউ কটাক্ষ করলে রাগ হয়।

তাই বলে সমালোচনা পরিহার করব এটা কখনই নয়। সমালোচনা উঠছে, ফাঁসি দেওয়া তো মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া মৌলবাদীদের তোষণ তো সব সরকারই করেছে। তখন যা করনি ৪৪ বছর পরে সেটা করে কি সমস্যা দূর হবে। লক্ষ লক্ষ নারীকে যারা ধর্ষণ করেছে যারা খুন করেছে তারাও তো লক্ষ লক্ষ। তাদের নাতিপুতিরা চক্রবৃদ্ধি হারে কয়েক কোটি। তারা আজ যে ভাল ভাবে বেঁচে আছে তা তাদের বাপ ঠাকুর্দার লুটের মালের পরে নির্ভর করেই তো? তাদেরও মরণ বাঁচনের ব্যাপার। আর কোওয়ামি মাদ্রাসা যার বিস্তার আগেই পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছি সেখানে অনেক কর্মসংস্থান হচ্ছে। এছাড়া ভূমি বন্টনের অভাবে বেড়ে চলা শ্রেণী বৈষম্য। শুনছি শ্লোগান 'ধর্ম যার যার দেশ সবার'। তাই বলে কি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' এর পাশে 'হরি ওঁ' কিংবা 'Jesus loves you' এই সব ভিন্ন ধর্মের বাণীও লিখতে চান? তার স্পষ্ট ঘোষণা কি শাহবাগে আছে? এদের কাজে অনেক ফাঁকও দেখা যাচ্ছে। ধর্মে অবিশ্বাসী অনলাইন ব্লগার এক্টিভিস্টরা মৌলাবাদী জামাত শিবির হিজবুলদের সহজ টার্গেট। তাদের হয়ে শাহবাগ আন্দোলন কই কিছু তো করছে না। তাই ধর্মীয় মৌলবাদের জায়গাটা বাদ দিয়ে জামাতকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে কোন লাভ হবে কি? মনে রাখতে হবে নাস্তিকরাও সমাজের একটা বড় অংশ। অবশ্যই তারা যুক্তিবাদী তারা র‍্যাডিকাল তারা প্রগতিশীল।

ঈশ্বর বাতাসের তৈরি একমাত্র মজবুত নির্ভরযোগ্য শিরস্ত্রাণ
—ব্লাশ্ on-৩৩/ রত্নদীপা দে ঘোষ

ফারহানা আহমেদ 'মুক্তমনা' ব্লগে আক্ষেপ করেন ঃ 'ব্যক্তিগত জীবনে একজন ধর্মহীন লোক এবং একই সাথে শাহবাগের গণজাগরণের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক হিসাবে আমার কষ্টই লাগে যখন দেখি ইমরান এইচ সরকার মাইকে উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করেন 'এখানে কোন নাস্তিক আছেন'? এবং উপস্থিত জনতা সমস্বরে আওয়াজ তোলে, 'না, না'। তিনি আরো বলেন আস্তিকরা ধর্মের নামে যে কোন বিষয়ে আপোষ করতে পারে। কিন্তু নাস্তিকদের সেই সুবিধে নেই। তাদের নিজের কাছে জবাব দিতে হয়। আমি যে পক্ষে আছি, কেন

আছি? কোন যুক্তিতে। মানসিক গঠন এরকম না হলে ঈশ্বরকে নিয়ে প্রশ্ন করা সম্ভবপর নয়। এ প্রসঙ্গে নাস্তিকবাদী বিখ্যাত ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিনের লেখার খানিকটা অংশ নিঃসন্দেহে উদ্ধৃতিযোগ্যঃ

ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করা যায় না, অর্জন করা যায় ঘৃণা এবং ভীতি। আমার লেখা হয়তো তাদের ধর্মগুরু বা রাজনৈতিক গুরু বা পীর সাহেবদের পছন্দ হয়নি। কারো সব লেখা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পছন্দ হওয়া শুরু করে, তবে অবশ্যই ধরে নিতে হবে লেখকটির মতো চরিত্রহীন এবং ভণ্ড আর দ্বিতীয়টি নেই। একজন চিন্তাশীল মানুষ যখন পাঠকের ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে লিখবে, পাঠক যেভাবে চায়, যেমন করে চায় সেভাবে নিজেকে তৈরি করবে, তখন সে আর মননশীল থাকে না, হয়ে পড়ে নিকৃষ্টমানের বুদ্ধিবেশ্যা —যে নিজেকে নানা রঙে রাঙিয়ে পাঠকের মন জয় করতে আগ্রহী, পাঠককে সুড়সুড়ি দিতে আগ্রহী। তাদের নাড়া দিতে, পাঠকের চেতনার ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়ে নতুন মননশীলতা সৃষ্টি বা চিন্তার জগতকে নতুন আলো দেখাবার ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। কারো যদি আমার লেখা পছন্দ না হয়ে থাকে, তবে খুব সহজেই আমার লেখা এড়িয়ে চলা যায়। আমার লেখা কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জামাতানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো আওয়ামিয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো ভগবানানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো মুহম্মদানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো আল্লানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো সেনাবাহিনীয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জাতীয়তাবাদানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো সরকারানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো মুজিবানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, আমার লেখা কারো জিয়ানুভূতিতে আঘাত করতে পারে, এরকম লক্ষ লক্ষ অনুভূতিতে আমার লেখা আঘাত করতে পারে। আমি জনগণের এই সমস্ত নানাবিধ অনুভূতির রক্ষণাবেক্ষণের দায় নিইনি, যারা তাদের এই সকল অনুভূতি অক্ষত রাখতে চাইবেন, তারা নির্দ্বিধায় আমার লেখা এড়িয়ে চলে যাবেন, কাউকে আমি আমার লেখা পড়তে বাধ্য করিনি। আমার বাক-স্বাধীনতার ব্যবহার আমি করে যাব, আমার কথা আমি বলে যাব। সময় নির্ধারণ করবে আমি সঠিক ছিলাম নাকি তারা, সময় নির্ধারণ করবে আমি কতটা সফলতার সাথে ব্যর্থ হয়েছিলাম, সময় নির্ধারণ করবে আমি সময়ের চাইতে কতটা অগ্রসর ছিলাম নাকি ছিলাম পশ্চাৎপদ।

আসিফ মহিউদ্দিন একজন বিখ্যাত ব্লগার এবং নাস্তিকতায় বিশ্বাসী। মুক্ত চিন্তার মানুষ। তার ক্ষুরধার লেখার সামনে দাঁড়াতে না পেরে, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে মগজধোলাইকৃত মৌলবাদী ভৃত্যদের কাজে লাগায়। আসিফের অফিস গেটের সামনেই সন্ধেবেলায় তার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ড থেকে যে ভেইনটা সরাসরি মস্তিষ্কে চলে যায় সেটাই কাটতে চেয়েছিল যাতে দ্রুত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু আঘাত টি জ্যাকেটের হুডে লাগায় গলার একটা বড় অংশ কেটে গেলেও সে কোনক্রমে বেঁচে যায়। এর পরপরই আর এক ব্লগার রাজীব হায়দারকে খুন করে। এখানে প্রাসঙ্গিক বলে মেঘদলের গানটি উল্লেখ করলাম ঃ

ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং, ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তত্পদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইক আল্লাহ শারিকা লা,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নেয়ামার্তা, লাকা ওয়ালমুল্‌কু
লা শারিকা লা।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।
বল হরি, হরিবোল, তীর্থে যাব
বিভেদের মন্ত্রে স্বর্গ পাব।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,
মানুষ কোরবানী মাশাল্লাহ্।
হালেলুইয়া জেসাস ক্রাইস্ট,
ধর্মযুদ্ধে ক্রুসেড বেস্ট।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হিন্দুনিধন ও শাহবাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু মৌলবাদীরা, গুজরাটে, আসামে মুসলমান অত্যাচারকে কেন্দ্র করে মুসলিম মৌলবাদীরা ফয়দা তোলার চেষ্টায় আছে। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন প্রাপক মেটিয়াবুরুজের 'কলম' পত্রিকা শাহবাগ আন্দোলন-এর বিরুদ্ধে এবং জামাত-ই-ইসলামির পক্ষে খোলাখুলি দাঁড়িয়েছে। এটাও তো যথেষ্ট ভীতিজনক। আমরা বুদ্ধিজীবীরা মেরুদণ্ডের অসুখে ভুগছি তাই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে তাড়ালে চুপ করে থাকি। সলমন রুশদিকে বক্তব্য রাখতে না দিলেও কিছু বলি না। নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েই বাইরের যুদ্ধ জয় করতে হয়। সেটা হয়তো ভুলে গেছি।

বাংলা দেশের তরুণ প্রজন্মের এই আন্দোলন এপার বাংলার মানুষকে বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। কফি হাউসে গিয়ে শুনলাম তিনতলার 'বই-চিত্র' তে শাহবাগ নিয়ে প্রদর্শনী চলছে। অধ্যাপক পুলক চন্দ শাহবাগে উপস্থিত থেকে আন্দোলনের যে সব দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করেছিলেন, সেগুলির নির্বাচিত ফটোগ্রাফ সঙ্গে রয়েছে তার রেকর্ডিং করা গান, শ্লোগান, বক্তৃতা। শাহবাগে না গিয়েও এখানে বসে তার উত্তাপটা পাচ্ছিলাম।

'দুয়ারে খিল টান দিয়ে তাই খুলে দিলাম জানালা
ওপারে যে বাংলাদেশ এপারেও সেই বাংলা'।

দুদিনপরে স্টুডেন্টস হলে এলেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক। তার ভাষণে শুনলাম কিভাবে শাহবাগ আন্দোলনকে তারা পিছন থেকে সাহায্য করছেন। 'মন্থন' পত্রিকার আয়োজনে আর এক অনুষ্ঠানে শাহবাগ আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয়কে দেখলাম নানা প্রশ্নের উত্তরে কথা বলতে বলতে তিনি আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। মনে হচ্ছিল ভাষা আন্দোলনের পুণ্যভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি। যে যুব সমাজকে এতদিন স্বার্থপর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম, ওরা কিছুই করতে পারবে না। শাহবাগ আন্দোলন সে ভুল ভাঙিয়ে দিল। রাত্রে এসে লিখলাম ঃ

আদ্যন্ত সবুজের গায়ে রক্তবরণ মৃত্তিকা
সেই তারুণ্যের কাছে মাথা নত করি
ভেবেছি ব্লগারদল নির্বোধ ছত্রাক
ভাঙে ভুল আত্ম-বলিদানে
আলোকিত বন্যায় ভেসে সকল সরণি এসে মিশে যায়
কেন্দ্রীভূত তাপে ফুলকি নেয় মুক্তির গর্জন
নক্ষত্রলোকের ইশারায় রক্তঋণ শোধে
টানা ম্যুরালে আঁকে ঘাতকের মুখ
ভিসা হাতে এসেছি মাটি নিতে
বড় বেমানান শ্রদ্ধাঞ্জলি তবু অবনত তারুণ্যের কাছে
যদি খুশি হয়—থাক

১৩.৭.২০১৩ অমিত চক্রবর্তী

উল্টো দূরবীন

একশো টাকা সহযোগিতা চাঁদার বিনিময়ে আপনার বইপত্রের বিজ্ঞাপন দিন।
জানুয়ারি (বইমেলা) মে (বৈশাখ) সেপ্টেম্বর (শরৎ) এই তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট জংশন), ধ্যানবিন্দু (কলেজ স্কোয়ার)
বইচিত্র (কফি হাউসের তিন তলায়), এস. কে. বুকস্, উল্টোডাঙা (সনির সামনে), প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল (রাসবিহারী), বিশ্বাস বুক স্টল (বহরমপুর)
শ্রীনিকেতন (বনগাঁ) বইওয়ালা (যাদবপুর)

নারায়ণ ঘোষের কবিতাঃ ভাষা ও শব্দের শরসন্ধান

এগিয়ে আসছে রেল স্টেশন

আমার জন্য প্রতীক্ষায় আছে আমি বুঝি
আমার জন্যই প্রতীক্ষায় থাকে প্রতিটি চিহ্নিত মোড়, প্রতিটি শব্দ
এবং শব্দের মধ্যবর্তী স্পেস
এবং কোনো সুনির্দিষ্ট ফেস্টুন
কোনো নির্ধারিত রেলস্টেশন ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে
আমার দিকে আমি বুঝি
একে একে রেললাইনের মধ্যবর্তী পাটাতনগুলো
সরে যাচ্ছে পেছন দিকে ক্রমশঃ অতিদ্রুত
বৃষ্টি ঝড় আর রোদ্দুরে পার্শ্ববর্তী সারিবদ্ধ বৃক্ষসমূহ থেকে
উজ্জ্বলতা এসে ছুঁয়ে যায় বুকের অন্তর্গত শব্দস্রোত

আমাদের জন্যই প্রতীক্ষায় আছে আমি বুঝি
এক একটি মাইলস্টোন ও তার মধ্যবর্তী স্পেস
এক একটি অনিবার্য মোক্ষম কবিতা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে
আমাদের দিকে হাসতে হাসতে
এগিয়ে আসছে প্রতিটি শব্দ, পংক্তি এবং
সুনির্দিষ্ট রেলস্টেশন।

পাখি বিষয়ক গবেষণার খসড়া

পাখিদের মধ্যে বসবাস করেছি; সেখানে বুনো ঘাস আর
ডালিম ফুল। তাদের রঙে পৃথিবীর গোলকত্বে অপার্থিব রঙতরঙ্গ
উথলিয়ে ওঠে।

পাখিদের কথাচালাচালির মধ্যে কোনো তুরপুন নেই। তিনটে
শালিখ রান্নাঘরের চালে আদৌ ঝগড়া করেছিল অথবা ত্রিকোণ
প্রেমের স্ক্রিপ্ট তৈরি করছিল, তা গবেষণার বিষয় হতে পারে।
কোন্ ঋতুর ঘটনা তাও ভাবা যেতে পারে। বর্ষা অবশ্যই নয়। এটা
আমার ধারণা। বর্ষায় শালিখরা ভেজে আনন্দে; বসন্তে
তিন-শালিখে চিঠি আসে—অনুশীলার এমত ধারণা।

আসলে পাখিদের মধ্যে বসবাস করে আমি যা বুঝেছি, তা হল :

১. পাখিরা অনুযোগ করে; অভিযোগও করে কখনো
২. তারা প্রেম করে; প্লেটনিক প্রেমও করে
৩. তারা ঝগড়াও করে

তবে—

১. কখনো কোনো পুরুষ-পাখি কোনো নারী-পাখিকে রেপ করে না
২. ঈভ-টিজিং করে না
৩. কখনো কোনো কাঠির অপব্যবহার করে না
৪. কারুর তুরপুন নেই

এরকম অনেক অস্তিবাচক/নাস্তিবাচক তালিকাই দেওয়া যেতে পারে। সেজন্য আরো কিছুদিন পাখিদের মধ্যে বসবাস করা দরকার। সেখানে ডালিমগাছ থাকলে খুব ভালো হয়; ডালিমফুলের রঙে ম্লানতা আছে, তা বড় সুন্দর।

ঝড় বা বিষণ্ণতা সংক্রান্ত

ঝড় বা বিকেলের বিষণ্ণতার জন্য কেউ যখন প্রতীক্ষা করে, বুঝতে হবে তার হাতঘড়ির ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে এবং ব্যাটারির সমস্ত দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সে তখন চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবে কারণ ওই লাইনে কোন ট্রেন চলে না শুধু ওয়াগন ভর্তি কয়েকটা বগি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ব্রেকারদের অপেক্ষায় আলোও কম থাকে।

সেই ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তবে তার কাছে কেউ দেশলাই খোঁজ করতে আসবে কিন্তু পাবে না, যদি মহিলা হয় তবে কয়েকটা রেপিস্ট তার চারপাশে ঘুরবে খাদকের মতন।

বালিকা

বালিকা বিষাদে আছে ওকে দাও শরীরের আঁচ
দাও কোল, থানকুনি পাতার ঝোল, নিশিন্দা প্রলেপ
সাত পাঁচ ভেবে লাভ নেই, লণ্ঠন জ্বালাও—
সেঁক দাও হৃদপিণ্ডে, মরমে পশিয়া দাও
শব্দবীজ। বীজতলা কুপিয়েছে যে পামর—
তার প্রতি ঘৃণাহুতি দাও।

ওই নির্বলা বালিকাফুল ফুটেছিল ইমনের সাঁঝে,
বিভাসের আগে ছিন্ন করেছে তার লাজবন্তী
কোমলাঙ্গ চিত্রকল্পখানি।

বালিকা সম্বিতে নেই, ওকে তাই রোমঞ্চন দাও।

সাঁকো

সাঁকো পেরুনোর আগে কেউ খেয়াল করে না
সাঁকো ভেঙে পড়তে পারে কিনা
এভাবেই সকলে নিশ্চিত মনে পার হচ্ছে নড়বড়ে সাঁকো
হাতে নীল ডায়েরি, প্রেমিকা পাশে
কারো হাতে সিঁদ-কাঠি রেশনের কার্ড জন্মপত্র ভোটের তালিকা লিট্‌লম্যাগ
অথচ সশব্দে রোজ বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার ছুটে যায়
পাগলাঘণ্টি সাইরেনে শব্দ ছোটে
সাগরের নীল জল উথালি পাথালি দেখে, বন্ধুরা সবাই হাত
ছাড়িয়ে সরিয়ে নেয় সচেতন অঙ্গীকার ভুলে
অন্যমনস্ক অভিনেতার মতো
এ সময় আমি কখনও কখনও ঘুমঘোরে সবচেয়ে
প্রিয়বন্ধুর নাম ধরে ডেকে উঠি চীৎকার করে :

না... রা .... ন না .... রা ..... ন .....

ঘুম ভেঙে গেলে বড় বেশি ক্লান্ত মনে হয়
ল্যাম্পপোস্টকে প্রেয়সী বা পরিত্রাতা ভেবে জড়িয়ে ধরি
মাতালের মতো

সাঁকো পেরুনোর আগে তাই আজ ভীষণ জরুরি
তোমার সাবধানী দুই চোখ, ভালবাসা।

ক বি তা

শূন্যতত্ত্ব
রেজাউদ্দিন স্টালিন

একমাত্র শূন্যই মৌলিক
শূন্য ভাঙলে অবশিষ্ট শূন্যই
আর এক ভাঙলে অর্ধেক
অর্ধেক ভাঙলে এক চতুর্থাংশ
এইভাবে ভাঙনের গর্ভ থেকে
বেরিয়ে আসবে ভগ্নাংশরা

শূন্য ব্রহ্ম — আদি ও অন্তের দ্যোতক
বোধি—অন্তরীক্ষ ও মৃত্তিকার অভেদ
সূচি—সত্য ও সন্তের উৎস
রূপ — ভাণু শশী ও পৃথ্বীসম
বল—অধঃ ও ঊর্ধের যোজক
নির্বাণ—জন্ম ও মৃত্যুর মর্ম
শূন্য হৃদি—ঈশ্বর ও শয়তানের আকর

বীজ ভ্রূণ অণু—শূন্য থেকে
গড়িয়ে গড়িয়ে গর্ভে
গর্ভ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে শূন্যে

বন্ধু
অশোক চট্টোপাধ্যায়

বন্ধু কি মুখের কথা বন্ধু চোখের মণি
বন্ধু তো ঝড়ের রাতে শানিত অশনি

দুই পা হাঁটলে বুঝি বন্ধু হওয়া যায়
দুটো ছবি দুটো কথা কিছু শিল্পকলা
কিছু তর্ক মাপা শব্দে কিছু কথা বলা

এটুকু সম্ভারে বনধু! দিল আরো চায়

অন্ধ হবে আনুগত্যে, প্রশ্নহীন হাতে
তুলে নেবে নির্দেশিকা সন্ধ্যা আর প্রাতে
তাঁর নাম কেবলম রণে জলে বনে
সে-ই শুধু ধ্যান জ্ঞান মস্তিষ্ক মননে

তবেই তো বন্ধু হবে, অন্নদার দাস
তাঁর কৃপাধন্য হয়ে হবে কীর্তিবাস

অন্যায় ন্যায়ের সংজ্ঞা নিরুপণে তুমি
যদিচ সংলগ্ন হও রক্তাক্ত ভূমির
যদি কোনো প্রশ্ন তোলো, করো প্রতিবাদ

তুমি তবে বন্ধু নও—নিষিদ্ধ নিষাদ

অরিকে নিধন করে যে কোনো কৌশলে
ছিন্ন শির এনে দিলে তবে বন্ধু বলে

এসো বন্ধু বসো বন্ধু থাকো বন্ধু পাশে
বিবেক বন্ধক রেখে অটুট বিশ্বাসে।

মূর্তি
মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়

মনে রেখো কবে দেখা হয়েছিল আমাদের
অদ্ভুত দূরত্বে আমি ভেঙেছি শপথ
সমস্ত ঐতিহ্য জুড়ে সহ্যশীল মান আর অপমানে
দাঁড়াব তখন পথে নিবিড় আশ্রয়ে
সরল অনুভূতির সুখময় স্মৃতি
আমাকে সান্ত্বনা আর সাহস যোগায়।
নিরুপায় হয়ে কেমন দাঁড়িয়ে থাকো দীর্ঘদিন।

যুগপুরুষ
শোভন মন্ডল

মা গিয়েছেন কাজে
কতদূর আমাদের কারর জানা নেই
বাবা মিলিয়ে গিয়েছেন মায়েরও আগে
অন্ধকারের ভেতর থেকে ছটপট করছে
তিনপুরুষের সম্পর্ক,
বিশ্বজগৎ ঘুরে ঘুরে সব পরিজন
সংগ্রহ করছে বেঁচে থাকার রসদ
আর আমরা যুগ যুগ ধরে
এই দ্যাখো কেমন পাত পেড়ে বসে আছি

দেবি
শম্ভু ভট্টাচার্য

বৃথাই আমাকে হতবল ভাবো, আমি অনায়াসে গিলে নিতে পারি
মেরু, মন্দর ও কৈলাস
আমি শূন্য পুরান হাতে শালে ভর দিই ময়নাপুর গ্রামে
সুবাধ্য পোষ্য হয়ে নেমে আসে সূর্যের ঘোড়া
নিজেকে নয় খণ্ড করে কাটি হাকন্দ-পোখরে
আটবাইচণ্ডীর মুখে বুক হ'তে রক্ত দিয়ে
তোমার জন্যেই এত রক্তপাত
ওরগোঁদার ভৈরব জানেন রক্ত বিনা দেবির চলে না—
আমার মাংস পরিতৃপ্ত করবে তোমাকে ...

মা বলেন 'পবিত্র হ' 'পবিত্র হ'
তুমি বলো 'শুদ্ধ হও' 'শুদ্ধ হও'
—যথেষ্ট পাপ ছাড়া কিভাবে শুদ্ধ হই আমি?

লৌকিক প্রসঙ্গ : ১. বাঁকুড়ার জয়পুর থানার ময়নাপুর 'ধর্মমঙ্গলের' উৎস 'শূন্য পুরান' রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের গ্রাম। এই গ্রামের 'হাকন্দ' পুকুরের পাড়ে ধর্ম ঠাকুরের কাছে পুত্র চেয়ে রঞ্জাবতী শূলে (শালে) ঝাঁপ দিলে লাউসেনের জন্ম হয় ও তাঁর সঙ্গে নেমে আসে সূর্যের ঘোড়া 'আণ্ডীরপাথর' — পরে এখানেই লাউসেন নিজেকে নয় খণ্ডে কেটে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করেন। ২. আটবাইচণ্ডী (হঁদপুর থানা, বাঁকুড়া) পাথরে খোদিত ভয়ংকরী গ্রাম দেবী ও বাঁকুড়ারই ওরগোঁদার ভৈরব অতি আদিম গ্রামদেবতা। ৩. রঙ্কিণী ভয়ংকরী বনদেবী—ঘাটশিলার পাহাড়-কন্দরে তাঁর প্রধান থান।

কেমনে নিষ্কৃতি সব জানে কবি...

শ্রুতি গোস্বামী

হয়ত বা পাখি আকাশে উড়লে কাল
সৈনিক এসে বলে যাবে, অপরাধ;
হয়ত বা নদী জোয়ারে তুললে পাল,
সৈনিক এসে বানাবে ক্রুদ্ধ বাঁধ।
ক্রমাগত রাজবাড়ি
বুক থেকে বুকে ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি।

আমরা বলেছি, ভালো লাগে ভালোবাসা
আমরা বলেছি, উড়ুক আকাশে পাখি,
যদি ছিঁড়ে যায় চৈত্রে রাঙানো রাখি
বুকের ওপর বুক এনে ব্যথা ঢাকি।

মানুষের খেলা খেলা হবে চিরকাল...
মিছে সৈনিক, সৈনিক উত্তাল;
মিছে রাজবাড়ি থেকে ছুটে আসে ফাঁস—
বুকের ভিতর ভেসে যায় রাজহাঁস।

('রাজহাঁস'/ভালোবাসা ভালোবাসা)

আমাদের এখন হাসতে মানা, বলতে মানা, অন্ধকারে চলতে মানা। অবশ্য সব কালের, সব আবর্তনের ক্ষেত্রেই রাজবাড়ি এরকমই অনড়। আর 'ভালোবাসা' তার বিরুদ্ধে মাথা-তোলা স্পর্ধার এক প্রতিশব্দ। যত রাজামন্ত্রীকোটালসৈনিকের গাঁথা দেওয়াল, বাঁধ, একুশে আইনের গরাদ আর গরাদ, তত দ্রুত ছুটে যায় ভালোবাসার বর্ণমালা—কবিতা।

কবিতা আর গদ্যের টানাপোড়েনে ভোগাটা বোধ হয় যে কোনো কলমজীবীর পক্ষেই অনিবার্য। তাকে শিরোধার্য করাটাই বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়। শিল্পীর মাতৃভাষা যা-ই হোক না কেন, দ্বৈরথটাকে এড়ানোর উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের কথা না-হয় বাদই যাক, কেন দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র বারবার সমান্তরাল কিংবা সম্মিলক পথে স্বতঃস্ফূর্ত নিরীক্ষা করে গেছেন; চর্চা করে গেছেন দুই মাধ্যমেই? উত্তরটা আসলে ওই স্বতঃস্ফূর্ততা, যা একসঙ্গে শৈল্পিক আর সচেতন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়, একজন নাটককার ও নাট্যকারের নাম, প্রথমত, কিন্তু প্রায় দু'শ বা তারও বেশি কবিতা তিনি লিখে গেছেন। চলতি বছরে ছাপা খবরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাবার পর কোনো কোনো পাঠক হয়তো ভেবেছেন, কোন পরিচয়টা 'প্রথম'? কালেজি বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যৌবনের প্রতিবেশী আনন্দ বাগচী বা কফি হাউসের টেবিলের অংশীদার শক্তি চাটুজ্যেদের স্মৃতিতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রথমে কবি। নাটকের নিজস্ব ঘরানায় প্রবেশের সঙ্গেই আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ে সেই পরিচয়টা, কিন্তু মুছে যায় কি? শিল্পের ক্ষেত্রে বাচনের মাধ্যম নির্বাচনে রূপান্তর, পরিণতি বা সরণ হতেই থাকে, কিন্তু নিজস্ব মগ্নতা রয়ে যায় প্রথম বলা মাতৃভাষায়। আসলে কবিতা তো শুধু সংক্ষিপ্ত বয়ানে বহুবোধক শব্দসমষ্টিই নয়, প্রতিটি আগ্নেয় সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের স্বর খোঁজার নাম কবিতা; নিজের কাঁধে মাথা রেখে আশ্রয় নেবার নাম কবিতা; এক অন্য নিভৃতিতে নিজের সঙ্গে কথা বলতে কবিতার উচ্চারণ। সেই কথা নিয়ে পরিক্রমা করতেই হয় শিল্পীকে—

কবিত্বে কি প্রয়োজন ছিল? শব্দ, সুমন্দ্রিত ধ্বনির উচ্ছ্বাসে
অমরতা কাম্য নয়। পৃথিবীর বিচ্ছুরিত আলোকের নিচে
নিজের সুস্পষ্ট হাতে করেরেখা পড়তে পারি, কোন দীপ্ত রেখা
রাজচক্রবর্তী হবে এ-কথা জানায়নি ভ্রমে। তবু নিশাকালে
কবিতা জ্বালায়ে রাখি, জন্ম থেকে একাকিত্বে বুঝি ভয় ছিল।

('উপসর্গ'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

কবিতা জ্বালিয়ে রাখলেন এজন্যেই। ১৯৬১-তে এই কবিতার সংকলনটি বেরোয়, সে সময় শুরু হয়ে গেছে সত্তার আন্তর্দ্বন্দ্ব। ১৯৬৩-তে আসে প্রথম নাটক কণ্ঠনালীতে সূর্য। তারপরেও ১৯৭২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কবিতার ভাষা আঁকড়ে রাখলেন নিজের জন্যে। একেকটি তীব্রতম সৎ চেতনাকে জনগ্রাহ্য পরিবেশনা থেকে আলাদা করে রাখলেন, কবিতা হয়ে থাকলো তাঁর নিজের কাছে অস্তিত্বের যোগ্যতা। কবিত্বের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

রবীন্দ্রনাথের কথা ধরা যাক। প্রতিনিয়ত সাহিত্য-প্রকাশের সম্ভাব্য সমস্তরকম পথে ঘোরাফেরা করেও কবিতা আর গানকে একান্ত নেশার মতো জিইয়ে রেখেছেন নিজের কাছে। কিংবা ধরা যাক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অদ্বিতীয় অধ্যাপক গবেষক শিশিরকুমার দাশের কথা। বৌদ্ধিক চর্চার চূড়ান্ত স্তরে পদক্ষেপ করতে করতেও কবিতার মাধ্যমটিকে আদি স্বরের মতো ধারণ ও পালন করে গেছেন শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ ভাবনার প্রকাশে সার্থকতর সার্থকতম মাধ্যমের ক্রমাগত অন্বেষণ ও প্রাপ্তির পরেও কবিতা যেন এঁদের কাছে হয়ে থেকেছে আত্মকথোপকথন, স্বগত ডায়েরি। মোহিতের ক্ষেত্রেও তেমনটাই।

হৃদয়ে এখন কালের দ্বন্দ্ব কোন্ সুরে ডাকি?

পঞ্চাশ-পরবর্তী সময়ের সংঘাত ধরা পড়েছিলো সিটি কলেজের যুবক-পড়ুয়ার সংবেদনে। সেই দ্বন্দ্বকে কোন্ সুরে প্রকাশ করবেন, আত্মপ্রশ্ন ছিল সেখানে, যা শিল্পের আদি প্রশ্ন। কালের দ্বন্দ্ব বড়ো অস্থির অভিঘাত ফেলে চলেছিল সে-সময়। কোনো সংবেদী মনই স্বাধীনতার টাটকা পালিশের আড়ালে ভয়ংকর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলতে পারেনি। 'পালানোর পালানোর আরো আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি' নিয়ে যাঁরা বেঁচে চলেছিলেন, বরিশাল থেকে বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটের ভাঙাচোরা বাড়ির তিনতলায় থাকতে আসা মোহিত হয়তো তাঁদেরই মধ্যে একজন। সেই স্মৃতি নাগরিক কাঠিন্যে আহত হতে হতে ক্ষোভের ঝলকের বদলে কেবলই গভীরতর, গাঢ়তর, আত্মসমাহিত, মন্দ্রসপ্তকের আলাপে বয়ে চলা—

রাজশ্রী মেঘের মুখে অনুরাগে পলাশের রঙ
তারপর ধীরোদাত্ত গুণান্বিত পুরাণপুরুষ
সূর্যের বেদনা
অরণ্য মর্মরে তার বধির সমুদ্র ছুঁয়ে বলে :
তোমার হৃদয়ে নীলপদ্ম ফোটে তাতে শুভ্র বরণের মালা হয়,
জানো?

('দিন বদল'/আষাঢ়ে শ্রাবণে)

১৯৫২ থেকে লেখা হয়ে ১৯৫৬-তে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আষাঢ়ে শ্রাবণে'। শব্দ-প্রযুক্তিতে সচেতন প্রয়াস, 'প্রসাধিত সময়ের ধূপ', 'আকাঙ্ক্ষিত ইন্দীবর মুখ'-এর মতো শব্দগুচ্ছ তৈরি, উপমার ঘনত্ব—পঞ্চাশ-ষাটের কবিতার অনেক লক্ষণে ভরপুর হয়েও মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে আলাদা করে দেয় ওই মন্দ্রসপ্তক। ক্রমাগত মিশ্রবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার কবিতাপাঠকের চোখে পড়তে বাধ্য। যেন ওই দীর্ঘ মাত্রায়, লয়ের ধীরতায় গভীরতাকে সন্ধান করেছেন। সেখানে আছে স্বরভঙ্গির নিচু তার, যন্ত্রণা-যাপনের নিজস্ব দীক্ষা। 'রোজ যার ফুল চাই সে এখন ফুল ছিঁড়ে কাঁদে'—এই ক্রমাগত কষ্ট। বিষাদবিলাস নয়, এই যেন গভীরতম বিষাদের উদ্‌যাপন। স্পষ্টই চোখে পড়ে, কোথাও উল্লাস নেই, চিৎকৃত স্বর নেই; তাঁর কবিতার ভাষ্যকার যেন প্রথম থেকেই প্রৌঢ়। সময়ের আঘাতে সে প্রৌঢ় হতে বাধ্যই ছিল, কিন্তু তা আসলে প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞতা ও পরিণতির নির্যাস। তাতে জীবনবিমুখ আলস্য নেই, প্রেম আছে, বিদ্রোহ আছে, উত্থান আছে, শিল্পের প্রত্যয় আছে—

আমাকে যৌবন-মন্ত্রে দীক্ষা দাও; অমিত স্পর্ধায়
বহুতে বলিষ্ঠ করো দীপ্তজয়, প্রতিষ্ঠ-প্রাণন...

('যৌবনের প্রার্থনা/আষাঢ়ে শ্রাবণে)

কবিতা ওই প্রাণন এনে দিয়েছে বারবার তাঁর কাছে। শিল্পের এক চিরায়ত জনক যৌবনের শেষতম বিন্দু থেকে কেবলই উত্তরাধিকারের সন্ধান করে চলে। বংশধরহীন ঝরে যাবার আশঙ্কা থেকে বলে—

যদি পুত্রহীন আমি কারে দিয়ে যাব এই উপবন হেমাঙ্গ হরিণী,
অই শকুন্তলা, খিন্নবালা; কবে জন্ম নেবে
উজ্জ্বল তমোঘ্ন শিশু।

('কবির উক্তি'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

এক কবি তার শিল্পে খুঁজছেন আত্মজকে, উত্তরপ্রবাহকে। গাঢ় মন্ত্রের মতো আস্তিকতার উচ্চারণ ঘটছে এ সময়ে—

ঝটিকার মধ্য থেকে কে আমাকে পিতা বোলে ডাকে
সিংহের উদ্ধত পৃষ্ঠে দীপ্ত শিশু—আমার পুত্রের নাম আয়ু।—

('উজ্জ্বল ফোয়ারা'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

রাজপুত্র মরে যেত যদি তাকে মণিপক্ষ পাখি না বাঁচাত

১৯৫৬-তে কবিতার ভাষায় বেশ বৈদগ্ধ্যের দ্যুতি ছড়িয়ে শুরু করেছিলেন মোহিত। সেই সময় একদিকে আছে সংস্কৃত -বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও অনুসারী পরিভাষা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভূত সংযোগ। একদিকে পল এলুয়ারের 'You cannot see her without loving her' কবিতার পরিগ্রহণে লিখছেন— আগে তাকে ভালোবাসো সমুদ্যত শৌর্য তারপর/তবে তাকে ফিরে পাবে-তার স্বচ্ছ মেঘের শরীরে/মাটির দুরন্ত দেহে মিশে হবে নম্র ভালবাসা— ('দূরের কান্না'), অন্যদিকে ছান্দিক নিরীক্ষা, অন্য বাচনভঙ্গির সন্ধান চলছে—কঠিন কালো অন্ধকারে দুচোখ ঢাকো, মা,/এ-কী করুণ মৃত্যু বলো, গাইতে পারি না। ('পূরবী')।

প্রয়াস পরিশ্রম কখনও কখনও প্রকট হয়ে উঠছে, শব্দ ও শব্দগুচ্ছ তাদের সন্ধিসমাস নিয়ে জটিল হয়ে দানা বাঁধছে। কিন্তু তাঁর ডিক্‌শন ভাঙছে না তার শীল। সেখানে অস্থিরতা আছে, উদ্বেলতা নেই। যে 'তিমিরান্ত সময়ের তীর' তাঁর কাঙ্ক্ষিত, তার প্রতি বিশ্বাস রেখে চলেছেন। সেই তিমিরমগ্ন সময়টাতে 'রূপমালা'রা পথের শেষে থাকে না, They happily lived ever after--এর মিষ্টি যৌথতার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ওই বিশ্বাসই তাঁকে 'কোমল গালে জলের দাগের মত পথ'-এর একান্ত অনুচ্চকিত সংবেদনের স্তরে নিয়ে যায়। সেইখানেই পাওয়া যায় মণিপক্ষ পাখিকে, যে বলে—

আমার ডানার ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে পদ্মরাগ পথ ধরে এসো
আমি জানি রূপমালা কোথায় শঙ্খের মত শুভ্র দেহে শুয়ে
দু'চোখে ছায়ায় গড়ে মমতার ঘর,
পৃথিবীর অন্যকথা সেই ঘর, সেই ছায়া জানে।

('রূপকথার গল্প'/আষাঢ়ে শ্রাবণে)

—কোলাহলের শহরের আড়ালে পৃথিবীর সেই অন্য কথা, সেই ব্যক্তিগত ঘর, সেই মণিপক্ষ পাখি—কবিতা।

আর সেখান থেকেই দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-তে আরও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠল মোহিতের কবিতা। যে বিষাদকে বরণ করেছিলেন তিনি, তার মূলে গভীর হলো প্রেম, ব্যাপকার্থে জীবনকে, তিমিরান্ত সময়কে ভালোবাসা, 'ভালোবাসা'-কে ভালোবাসা। ক্রমশ স্থিতি আসছে শান্ত হচ্ছে স্বর, ভাষাছন্দলয়ের চলন, আর আসছে নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণ, তথা বয়স। তাকে বোলো—যদি কোনো রিক্ত মাঠে দেখা হয়ে যায়—/ফিরে আসা ভুল হবে, তবে ফিরে যেন সে তাকায়। ('তাকে বোলো'/আষাঢ়ে শ্রাবণে) — ক্ষিতিহীন দূরত্বের প্রতি এই যে আকর্ষণ প্রথম বইতেই এসেছিলো, তা গভীরতর হলো। গ্রন্থি খুলে শূন্য মাঠ থেকে শুধু এক নিমেষের তাকানোর মতো প্রেমকে হৈমন্তী করে তুললেন। প্রেমের সেই আইডিয়ার নির্মাণটিই মোহিতের কবিতার দীর্ঘস্থায়ী ভরকেন্দ্র, যাতে যুক্ত হয় কবির একান্ত আত্মনির্মাণও—

হে আস্বাদিত দুঃখ তুমি বাম পার্শ্বে বোসো,
আর এই সুমঙ্গলা রমণী দক্ষিণে;
আমি মধ্যবর্তী থাকি, কথা বল তোমরা দুজনে
কলহ কোর না, ঊর্ধ্বে গোধূলির আলো বড় নির্জনতাপ্রিয়।

('প্রেম, পুনর্বার'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

প্রেম থেকে, তথা সম্পর্ক থেকে প্রেমের আইডিয়াকে এভাবে নিষ্কাশিত করে নেওয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা আসন দিয়ে বিহঙ্গদৃষ্টিকে প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় হয়ে উঠলো। আর তার সঙ্গে একীকৃত হতে থাকলো কবিতা-সঙ্গীত-রঙ-দিনচক্র-শিল্প সম্পর্কে বহুমাত্রিক ইন্‌টারপ্রিটেশন। বিজ্ঞাপিত সময়ে, যেখানে কেন্দ্র থেকে পরিধি যোজন দূরে, শব্দের ভিড়ে অবিশ্রাম কলরবে যেখানে কারা তলিয়ে যায়, প্রেমের সমারোহের নীচে প্রেমই লুকিয়ে পড়ে, সেখানে নিজেকে প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রেমকে প্রত্যক্ষ করলেন দূর থেকে। এ যেন খানিকটা নিস্পৃহতার দর্শন, তাকে ইন্‌ডিফারেন্স বলা যায় না, ইন্‌ভিভিজুয়াল সেল্ফ-এর প্রকাশ বললে তাকে ধরা যায়—

ভালোবাসো নিরন্তর, যে চেয়েছে অবিরাম গাঢ় সন্তরণ।
আমি এই জানালার পার্শ্বে যাই।...
বড় শ্রমসাধ্য লাগে দরজা খুলে উদ্যানে বেরোতে
কে যেন অনেক দূরে, বুকের পাতাল থেকে নিষেধ করেছে।

কেন কেহ পৃথিবীতে অন্তরালে বিরহ চেয়েছে।

('অন্তরালে'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

প্রেম এক তমোহীন দেশ। কালো মেঘে দেবদূতেরা ডুবে গেলেও সেই প্রেম জন্মাবধি 'প্রকৃতির মতন সহসা', যার গোলাপের কাছে পরাভূত সিংহাসনের 'সংখ্যাতীত সৈন্য'। প্রেম-প্রতিবেশের নিয়ত দ্বন্দ্ব থেকে সেই প্রেমক খুঁজে আনাই কবির লক্ষ্য। কিন্তু তার কোনো সরল সমীকরণ নেই। হন্তারক প্রতিবেশ ও হন্যমান প্রেমের সংঘাতটা প্রতিবার নতুন করে আসছে, সেইখানে ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে প্রতিবার আয়ত্ত করছেন মোহিত, সেখান থেকে প্রতিবার নতুন করে জারিত হচ্ছে প্রেম। ঠিক আস্তিকতা নয়, এখানে অন্বেষাটাই আসল—

অনুরোধ করি, হারায়ো না কৈশোর
দ্যাখো না, দোলনা তারকায় বেঁধে নিয়ে
দোল খায় এক জোনাকির লঘু দেহ;
আমরাও পারি, পারতাম; মনে আছে।
চিরকাল প্রেম বালক বয়সী থাকে।

('জুঁই-কে'/গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

এই কৈশোর রোমন্থিত হয়েছে বারবার, নেহাৎ স্মৃতির মতো নয়, সত্তা ও ভবিষ্যতের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে; যা পিছনে 'যাত্রার বিবেক'-এর মতো গায়, রাজতখ্‌তের বাইরে 'দ্বিধাহীন ক্রীড়াভূমি' রাখে। 'আমলকি চিবিয়ে জল খেয়ে' মিষ্টি হাওয়া 'ছোটবেলার জিভ', কাগজের নৌকো, কলাগাছের খোলায় নবান্নের গন্ধ, 'ছোটবেলার ঈশ্বর' হারিয়ে গেছে ক্রমশ। কিন্তু কবিতার কিশোর প্রত্যাশা হারায়নি।

তবে কবি আর কবিতার মধ্যে সম্পর্কটা এখন দাঁড়িয়েছে অনেকটা আক্ষেপানুরাগে। কবিতার কাছে যা চাইছেন, তা না পাওয়ার বিষণ্ণতা, আর কবিতা যা চাইছে কবির কাছে, তা দিতে না পারার ক্রন্দন যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে কোথাও। একদিকে বলছেন, কবিতা আহার চায়, শুধু/ঈশ্বর সাজাতে পারে এই থালা, আহার্যে ব্যঞ্জনে, আবার অন্যদিকে সঙ্গে-সঙ্গেই বলছেন, যা ছিল বিশুদ্ধ সাদা সবটুকু দিয়েছি তোমারে .../এত স্বার্থহীন করে গূঢ়/কবিতার আবির্ভাব, এতখানি নিয়ে যায়, এত/শূন্য করে আবর্জনা রেখে যায়; তবু যাঞ্চা করি। ('কবিতা সম্পর্কে'/ভালোবাসা ভালোবাসা)

পারস্পরিক প্রত্যাশাই কবিতা নামক ফর্মে আধার-আধেয় মিলিতভাবে আরো নিরীক্ষার জন্ম দিয়েছে। ১৯৬৯-এ 'অংকনশিক্ষা' নামে যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়, তাতে ছড়ায় বা গদ্যচলনে বেশ সচেতন অভিপ্রায় থেকে মোহিত পরীক্ষা

চালালেন দুটো শিল্পের ছাঁচ নিয়ে। সরলরেখা, ব্রিজ, সিঁড়ি, রান্না, বেলুন, গ্রামাফোন, চরিত্র, চিকিৎসা, চিঠি, ফুটপাত, গোলাপ, ক্যামেরা, প্রতিধ্বনি—এই চোদ্দটি বিষয়ে। 'গিমিকময়' বলে অভিযোগ আছে, কিন্তু একসঙ্গে এতো নাটকীয় ও সাংকেতিক বাচন অন্য কোনো কবিতাতেই আর ব্যবহার করেননি তিনি। সংক্ষেপে সংকেতময় কিছু একটা এঁকে নিন দ্রুত/যেমন হাতছানি—/সম্ভবত এটাই সিঁড়ি। কিংবা, আসলে সব চিকিৎসকই ঘড়ি সারান—এই জাতীয় অ্যালিগরির এতো প্রয়োগ আধুনিক শিল্পের মূলগত সংজ্ঞাকে যেন অ্যাপ্রোচ করতে থাকে। আধুনিক থিয়েটারের প্রয়োগকৌশলের মতো যেন কোনো একটা সাজেশনের সংকেতে মোহিত প্রতিস্থাপিত করেন অন্য একটা ভাবনা বা ধারণাকে।

স্তব্ধতার থেকে বড় সাংঘাতিক শব্দ নেই মানুষের কাছে...

যতো সময় গেছে, আরো বেশি সাজেস্টিভ আর ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে মোহিতের কবিতা। বিশেষ করে ১৯৬৫-র 'শবাধারে জ্যোৎস্না'র ৪৬-টা কবিতার প্রতিটাই যেন একেকটা আদ্যন্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায়। সে-সময় তাঁর প্রধান মাধ্যম নাটক, আর কবিতা নির্জনে নিজের। বলা ভালো, একটা জীবনবোধ যেন মূর্তি নিয়েছে কবিতায়। হতে পারে তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনলব্ধ, হতে পারে তা শিল্পের পথ থেকে সংগৃহীত। এক 'শবাধার'-এর নৈঃশব্দ্য আর তাতে পড়া রাত্রির আলো ওতপ্রোত হয়ে ভাবনাকেন্দ্রে আনে একটা চলে যাবার বোধ, আর তার শৈল্পিক প্রকাশ-কে বিষাদের সম্ভাব্য সমস্ত ধ্বনি দিয়ে ভরিয়ে রাখেন তিনি। বাড়তে থাকা বয়স, আখেরসর্বস্ব শহুরে যাপনচিত্র যেন নিরাময়হীন ব্যর্থতার জন্ম দেয়—

এখন বন্ধুর কাঁধ থেকে খসে নির্বিকার হাত;
দলের টেবিল থেকে পিঁপড়ের মতো
দু-একটা চিনির টুকরো গিলে ফেলে টেবিলের পায়া
বেয়ে বেয়ে নেমে যাই বিমর্ষ ভঙ্গুর।...
এখন পলাশ তুমি কোথায় কে জানে?
কোথায় ফুটলে ঠিক ফোটা হয়, এই সব ভেবে
তোমার কেটেছে বেলা, আমারো গিয়েছে মেঘ
খুঁজে খুঁজে ময়ূরের পাখা।

(৩৪/শবাধারে জ্যোৎস্না)

এমন ইমেজারি বা চিত্রকল্পের প্রতি দুর্বল (biassed) হয়ে পড়াটা পাঠকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এমন অজস্র কল্প জমাট বেঁধে আছে 'শবাধারে জ্যোৎস্না'-র শব্দমালায়। প্রবল নৈরাশ্য আর তিক্ততায়, 'বড় জনহীন' লাগার অনুভূতির মধ্যে সেই শব্দের রাস্তাতেই ক্ষোভের মোচনমুখ খুঁজে নেন মোহিত। কলকাতা শহরের লুব্ধ ল্যাম্পপোস্ট, উল্লসিত নিয়ন, ফাটা বেলুন, ট্যাক্সি-বাসের ক্লিষ্ট আওয়াজ, সদা-নির্বোধ কার্নিভাল-এর দিকে চাবুকের মতো প্রত্যাঘাত রাখেন—

কলকাতা, তোমাকে কিছু সময় দিলাম
যদি পারো বদলে দাও
অন্যথায় বালিশের ম্রিয়মাণ নীচে
ডিনামাইট রেখে দিয়ে চোখ বুজে ঘুমোব নির্জনে
যেরকম পান মুখে দিয়ে অনেকে ঘুমোয় শান্ত ছুটির দুপুরে।...

(৩৬/শবাধারে জ্যোৎস্না)

এই অংশ উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিসত্তার উদ্ধত স্পর্ধাকে দেখানো নয়, বরং 'বালিশের ম্রিয়মাণ নীচে'-র সংস্থান-ও। একবার দ্রুত পাঠে হয়তো এই সংস্থান চোখে পড়বে না। আর সেই অনুচ্চকিত অমোঘতা-ই সৎ কবির বা সৎ কবিতার লক্ষণ হয়ে ওঠে।

মোহিতের পাঠক বুঝতে পারবেন, এই সততা থেকেই দ্বিতীয় ফর্মটির মধ্যে জড়িত ও জারিত হয়ে থেকেছে কবিতা। ১৯৬৩-র কণ্ঠনালীতে সূর্য থেকে আরম্ভ করে মোহিতের প্রথম পর্যায়ের সমস্ত নাটক-ই আসলে ছদ্মবেশী কবিতা। তাই এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে যাতায়াত করার সময়ে যতোই পুরনো ফর্মটিকে কটাক্ষ করুন না কেন, অন্দরে লালন করেন তাকেও। কণ্ঠনালীতে সূর্য-র চরিত্র সমীর ন্যাকা কবি প্রজাতির আর্কিটাইপ। তাই সারাক্ষণই বাস্তববাদী প্রেমিকা মিলুর বিরক্তির উপাদান সে। কিন্তু এই কনট্রাস্ট-এর পাশে যেই বেনামি 'লোকটা' চরিত্র এসে উপস্থিত হয়, ডাইমেনশন বদলে যায়। সেখানে কণ্ঠনালীর মধ্যে সূর্যের আটকে থাকা, কাশলে অজস্র পিংপং বল সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়া, মানুষের 'এ গ্রেট মেটাফিজিক্যাল ডগ' হয়ে যাওয়া—এগুলোই হয়ে পড়ে বা হয়ে ওঠে রেফারেন্স ফ্রেম। চতুর্থ অঙ্কে তাই ভাবনার দৃশ্যগুলোই মঞ্চের ফ্রেমে চলে আসে। অগ্নি যেন বাক্, আর সূর্য যেন শব্দ। কথায়, সংলাপে সেই সূর্য গদ্যের পরিচিত আখর ভেঙে পিংপং-এর মতো হাজার উজ্জ্বল অগ্নিকণার মতো ছিটকে পড়ে। পাল্টে যায় ভাষা, নামের বদলে মানুষের পরিচয় হয়—''পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির মনুষ্যাকৃতি প্রাণী। ... পাপ এবং পুণ্য চিনি না, চেনা দুঃসাধ্য মনে হয়। ... জলের থেকেও মাটি কম বিপজ্জনক নয়, অনেক ডুবেছে দেখেছি। ... পিপাসা খুব বেশি, জলও বেছে খেতে হয় বলে বিপদ। এসব লিখলেই আমাকে চেনা যাবে, নাম বোধহয় চাই না।''

১৯৬৫-র মৃত্যুসংবাদ-এর শুরুতেই মঞ্চসজ্জায় 'বাস্তবের যথাযথ অনুকরণ'-এর বদলে 'নাটকের ভাবগত চরিত্রের সপক্ষে বিন্যাস' - কে তুলতে চেয়েছেন মোহিত। সেখানে প্রায় একই কাঠামো—একটি গোছানো সংসারী মেয়ে বুলু, ইনসিকিওর্ড প্রেমিক সুবোধ, প্রৌঢ় নীরেন, আর এক আগন্তুক 'লোকটি'। তার ধারণা সে তার বাবাকে খুন করেছে কয়লাভাঙার হাতুড়ি দিয়ে, সারাক্ষণ সে খোঁজে ছোটবেলায় হারানো প্রজাপতি, দৈবাৎ সেটা দেখতে পায় কোনো মেয়ের চোখের মণিতে, শাড়ির ভাঁজে, ঘাড়ে, গালে। সে একটা স্কুল বানাতে চেয়েছিলো, যেখানে শেখানো হবে কথা বলা, হাসা, বিষণ্ণতা, ভালোবাসা ও ভালোবাসা ভেঙে দেওয়া, থুতু ফেলা, বমন, পদাঘাত। তার বাবা চেয়েছিলেন একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্রিজ বানাতে। কেউ-ই কোনোটা পারেনি অবশ্য, মৃত্যু বা মৃত্যুর ধারণা নিয়ে পালিয়েছে বারবার। 'লোকটি' বলে, ''আমরা কোনকালেই সম্পূর্ণ হতে পারব না। ... ছোটবেলাতেই কেবল কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে বৃত্ত এঁকেছি।... সার্কেল আর স্ট্রেট লাইন-এই দুটো আঁকার জন্যেই তো আমাদের জীবন।'' ... —ক্রমাগত এমন সাজেস্টিভিটি, মিত উচ্চারণ, ভাষার ইঙ্গিতচিহ্ন শিল্পসংরূপ-এর ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। শেষ দৃশ্যে প্রজাপতি ও ভিমরুলের যুগপৎ উপস্থিতি, মঞ্চে ওড়া রঙিন বুদ্বুদ, লোকটির হাতে বুলুর বাঁধা ব্যান্ডেজ-এ বাহিত হয় আরেক জাতকসংবাদ। আর আগন্তুকটির মতোই যেন নাট্যমাধ্যমে 'ঘটনা'র বদলে ক্রমশ 'ধারণা'য় স্থিত হতে থাকেন মোহিত নিজেও।

১৯৬৬-র চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড-র ভরকেন্দ্র-ও একটি ভাবনা, ঘটনার বৃত্ত তাকে নিয়েই, ঘটনার নিজস্ব অস্তিত্ব নেহাত অদরকারি। পূর্বোক্ত দুটোর 'লোকটি' এখানে হয়েছে 'প্রেত', আসলে সে 'অভিভাবকত্ব'-র বিরুদ্ধে থাকা, জীবন-মৃত্যুর বাইনারির বাইরে এক অ্যাবস্ট্রাক্ট ভালোবাসা। তাই সে শান্তা ছাড়া বাকিদের কাছে 'অশুভ সংক্রামক'। চেয়ারম্যান চিন্তিত মেয়েদের বেশি মাত্রায় 'লভ' করা নিয়ে; অ্যাদ্দিনের আইনকানুন ভাঙা লোকদের বাড়ির পাশে সর্বেশ্বর হাটি ও মাখন প্রেতের পায়ের ছাপ দেখতে পায়। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যতো কড়া হয়, ছাপ ততো গভীর হয়। কিন্তু এখানে আগের মতো ঘটনা-ধারণার সংঘাত নেই, বরং প্রেত বা শান্তার বিপরীত রাজ্যও একইরকম ইনডিভিজুয়াল, একইরকম অন্তরঙ্গ সংকটমুখর। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভাষিক স্তর, আলাদা আলাদা কবিতা। প্রেতধরা ইন্সপেক্টর-এর সহকারী রাধাগোবিন্দ আকাশের নোট নেয়; ভাঙা জমিদারকুলের শেষ প্রাণী মল্লিকবাবু বাইনোকুলার দিয়ে মৃত পোষা পাখিদের খোঁজেন; সীমা বলে, ''মায়ের গর্ভে যে ভ্রূণ থাকে, প্রথম এক অবস্থায় তা চার-পাপড়ি ফুলের মত দেখতে। এই ফুলটাই গন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে আমাদের স্বভাবের মধ্যে মিশে যেতে থাকে।'' ...; ডাক্তার স্বপ্নে দেখেন দুই শিশুর ওড়ানো লাল ঘুড়ি তাঁর হাতের সুতো লেগে ছিঁড়ে যাবার দৃশ্য,—অজানা পাপবোধ;

'উই আর ইন দি গ্রিপ অব ড্রিমস' টের পেয়ে ইন্সপেক্টর-এর অন্তঃস্থ 'গানম্যান' অজান্তে এসে মেরে ফেলে প্রেতকে। আর ডাক্তার- মল্লিক-চেয়ারম্যান-এর সমবেত স্বর অমোঘ ধ্বনি তোলে—''মৃত্যুও ছাড়ে না, বন্দুকের থেকেও তার গর্জন আরও কঠোর।''

প্রচলিত ধারণা, মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক নামক জনসংযোগী মাধ্যমটিকে তুলনায় বেশি উপযুক্ত মনে করে আত্মস্থ করার পর কবিতাকে নির্বাসন দেন সম্পূর্ণ। কিন্তু নাটককারের নিজস্ব বয়ান—''কবিতার মন থেকে আমি নাটক লিখেছি এবং আমি নিজে মনে করি যে, আমার নাটকের মধ্যে আমার কবিতাসত্তাটা কাজ করে। কবিতা আমাকে নাটক লেখায়, তাই নাটকের মধ্যে কবিতার রেশ থাকবেই, তার ধর্ম থাকবেই, কবিতার চরিত্র থাকবেই।'' (উৎস ঃ 'কবিতা ও নাটক : প্রসঙ্গ মোহিত চট্টোপাধ্যায়', পঙ্কজ মুন্সী/'কবিতা সংগ্রহ', মোহিত চট্টোপাধ্যায়)। তাঁর নাটকে কবিতার রেশ, ধর্ম ও চরিত্র কিভাবে থাকলো, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। অতি সংক্ষেপে কিছু দৃষ্টান্ত কেবল দেখানো সম্ভব হলো। বাদ রয়ে গেলো সংলাপে হুবহু কবিতা-পঙ্‌ক্তির ব্যবহারগুলো, বাকি থাকলো দ্বীপের রাজা-র দুঃস্বপ্ন বা স্বপ্নে ফেরার অনন্য অভিব্যক্তি, কিংবা ক্যাপ্টেন হুররা-র স্থাণু জাহাজের নতুন দেশের ডাঙ্গার অন্বেষার লীন জঙ্গমতা, এমনকি বাকি রইলো মোহিতের একাধিক কাব্যনাট্যের কথাও। প্রসঙ্গটা তাই অসম্পূর্ণ, কিন্তু ওই রেশ, ধর্ম ও চরিত্রকে তিনি যে এড়াতে পারলেন না, বরং নাটক নামক ফর্মটির সংলাপ, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদি অবেজক্‌টিভ প্রত্যক্ষতাতেও কবিতার শরীর এবং সংরূপগত গভীর স্তরগুলো বাধ্যত সক্রিয় থাকলো, আসল কথা এটাই।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সাহিত্যিক মূল্যবিচার বা তাঁর কবিসত্তা-নাটককারসত্তার সংঘাত-ইত্যাকার কোনো প্রস্তাব আমরা তুলছি না—তুলতে চাইও না। অন্বেষণ ছিলো কেবল ওই সততার; কবিতা নামক শিল্পমাধ্যমটির ক্ষেত্রে, যেখানে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত, সবচেয়ে নির্জন, এবং সবচেয়ে নির্মমভাবে সৎ। বারবার এজন্যেই তাঁর কবিতার শেষপ্রান্তে দেখা যায় কিছু নির্দিষ্ট সমাপ্তি বা রেজল্যুশন। কবিতা বা যে কোনো শিল্পেই প্রত্যক্ষভাবে এই রেজল্যুশন বা কনক্লুশন না থাকারই পক্ষপাতী অধিকাংশ আধুনিক শিল্পীমানস। কিন্তু আদতে এই সমাপ্তির দৃশ্যত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে কিছুই প্রমাণ হয় না। বরং বিচার্য, কতোটা অভ্রান্তভাবে বাচনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় সেই সমাপ্তিসূত্রটি নিষ্কাশিত হচ্ছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এখানেই অব্যর্থ। তাঁর সেই সূত্রগুলি কবিতার শব্দে সমর্পিত, দৃশ্যমান, এবং তা অভ্রান্তভাবে সেই চিন্তনপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে আগত বলেই আরোপিত বলে মনে হয় না। এজন্যেই তা সৎ। তাই কোনো নিভৃত বীণা না শুনতে পাওয়া, কোনো দুর্নিবার মুখশ্রী-দ্রূযুগ অনায়ত্ত থেকে যাবার আশঙ্কা শেষপর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে। কিছু নীলপদ্ম, কিছু ডালিমের কণা, শিশির, দ্রাক্ষালতা, কিংশুক, মেঘক্লিষ্ট দিন, বালিশের ম্রিয়মাণ নীচ, বকুলতলায় থেমে যাওয়া ঘড়ি—এদের মধ্যেই কবিতার নির্বাণ, শিল্পের নিষ্কৃতি—

অমন বকুল আমি বনতলে অনেক দেখেছি,
শুনেছি গহন গান; কুড়ায়েছে যেসব আঁচল
তাদেরও রেখেছি মনে; ভুলি নাই যেহেতু স্মরণ
হারালে উদ্যান থেকে উড়ে যায় সমস্ত ভ্রমর।
জন্ম থেকে শুনি আমি চলে যাব, হয়ত কেবল
সঙ্গীতের কাছে ঋণ থেকে যাবে আর সে বকুল।

(৯/শবাধারে জ্যোৎস্না)
পুণর্মুদ্রণ : আরেক রকম

কথা প্রসঙ্গে

বিজিতকুমার দত্ত

এই অস্থির সময়, এই একুশ শতক, তত্ত্ববিশ্ব থেকে সরে এসে তথ্যবিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রবলভাবে উদ্‌গ্রীব। এ কারণে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের মহান স্রষ্টার সৃষ্টির চেয়ে তাঁদের জীবন নিয়ে কোলাহলের আতিশয্য বড় বেশি চোখে পড়ে।

একটা সময় ছিল যখন আমি নিজে গত শতকের ভাষাতাত্ত্বিকদের 'পাঠ' বা Text-এর প্রাধান্য নিয়ে কোলাহলের প্রবল বিরোধী ছিলাম—কারণ, সেই ভাষা-আন্দোলনের মুখ্য বক্তব্য ছিল, সাহিত্যে লেখক বা Author-এর ভূমিকা গৌণ, Text-ই আসল এবং সেইটিই ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকদের একমাত্র বিচার্য। লেখকদের এই মৃত্যুঘন্টা বাজানোর এই তত্ত্বকে আমি মেনে নিতে পারিনি। তাঁদের এই ঘোষণা আমার কাছে ফতোয়া বা মৌলবাদী ঘোষণা বলে মনে হয়েছিল।

জীবনের অন্তিমে এসে, এবং সাহিত্য-শিল্পসম্পর্কে প্রবল তথ্যের জোয়ারে বন্যাপ্লাবিত হওয়ার অবস্থায়, আমি আগেকার অবস্থানে স্থির থাকতে পারছি না।

বিদেশের সাহিত্য শিল্পের বা বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করব না—যেহেতু সে সম্পর্কে আমার ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু দেশের মধ্যে দুই মহান ব্যক্তিদের দ্বিশতবার্ষিকীর আয়োজনে উপলব্ধি করেছি, এক্ষেত্রে আড়ম্বর ও নিছক দেখানেপনার যে আতিশয্য, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শব্দায়মান হয়েছে, তা স্তম্ভিত করে দেবার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় -এর আদর্শ, বাঙালি সমাজের স্বেচ্ছা-নির্বাচিত অভিভাবকেরা কোনোদিনই আন্তরিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। পারার কথাও নয়। তাই সংবাদপত্রে কিছু উৎসব আয়োজনের বাহুল্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধোঁয়াটে বক্তব্য সহ সচিত্র পরিবেশনের আড়ম্বরই ঘোষিত।

কবিতা বা উপন্যাস বা সাহিত্য-আলোচনায় আধুনিক বাঙালি পাঠক আর আদৌ আগ্রহী নয়—যদিনা সে সব চকচকে ও ঝকমকে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং অবধারিত ভাবে তার মধ্যে কিছু মহান ফিল্মিব্যক্তিত্ব ও রাজনীতির কাণ্ডারীদের সাড়ম্বর ঘোষণা থাকে, তাহলে সেসব পত্র-পত্রিকা করুণারও অযোগ্য।

একথা অবশ্যই সত্য, আধুনিক যুগে, অর্থাৎ সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের পরিবেশে সাহিত্য অনেক বিষয়ের দোসর হয়ে দাঁড়িয়েছে; বরং বলা উচিত সাহিত্যের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন সমাজতাত্ত্বিক-ইতিহাসবিদ-রাজনৈতিক ভাষ্যকার এবং অবশ্যই সবজান্তা সাংবাদিকবৃন্দ। ফলে সাহিত্য হয়ে উঠেছে তাঁদের সুখী মৃগয়াক্ষেত্র। বিশেষ করে নামী দামী পত্রিকার প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন সাংবাদিকরাই, যেহেতু আমাদের ভাবনাচিন্তার নিয়ামক হয়ে উঠেছেন, সুতরাং তাঁদের অনুগ্রহেই তো সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। তাই অধ্যাপক শ্রেণীর নামী দামী ব্যক্তিরা তাঁদের দ্বারস্থ হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে যে এই মহান সাংবাদিকদের অঙ্গুলি হেলনে ও প্রসাদ বিতরণের তারতম্যে সাহিত্যিক-কবি-উপন্যাসিকদের বাজারদর নির্ধারিত হয়। যে পদ্ধতিতে বাজারে চালু নতুন বা পুরনো বাণিজ্যদ্রব্যের প্রচার বা বিজ্ঞাপন পত্র-পত্রিকায় সাড়ম্বরে ঘোষিত হয়, সেই একই পদ্ধতিতে লেখকদেরও বাজারদর নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অবশ্য মার্কসবাদী সমালোচকরা বহুদিন ধরে ঘোষণা করে যাচ্ছেন যে বুর্জোয়া সভ্যতা সবকিছুকেই পণ্যদ্রব্যে পরিণত করে—সে সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুটা পার্থক্য আছে। বিনোদনের উপকরণকে মহিমান্বিত করার জন্য শিল্পীসাহিত্যিকদের পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকে; যদিও

বাণিজ্য প্রভুদের জন্য পুরস্কারের বিষয়টি নেপথ্যে থাকে। সে সব কাণ্ডকারখানা নিয়ে রাজনীতি ও গণমাধ্যমে সাময়িক হৈ চৈ হয়, তারপর সবই শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে যায়। আমার মনে হয়, এই নেপথ্য পুরস্কারটি (তার নাম উৎকোচ-ঘুষ-দুর্নীতি যাই হোক) গণমাধ্যমের বড় প্রিয় বিষয়; তাকে কেন্দ্র করে প্রচারের আবহ রচনা করে তাঁরা নিজেদের আর্থিক ও পারমার্থিক উন্নতির সোপানে পা রেখে সমাজের উচ্চমঞ্চে উঠে যান। ফলে দেশের আর্ত-অসহায়-বিধ্বস্ত-উপায়হীন এবং অত্যাচারিত মানুষদের অবস্থার হেরফের ঘটে না। সচেতন পাঠকদের কি মনে পড়বে এ বিষয়ে প্রয়াত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা?

''রাজা আসে আর রাজা চলে যায়/এই রাজা আসে ঐ রাজা যায়/নীল জামা গায়/লাল জামা গায়/মুখোসের শুধু রঙ বদলায়/আর ঢং বদলায়/দিন বদলায় না''।

একটি বিষয় আমার কাছে বিচিত্র জিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে। প্রায়,Paradox বললে ঠিক বলা হয়। বাঙালি পাঠকের এক নগণ্য শতাংশ কবিতা পাঠক, অথচ কবিতা লেখকদের সংখ্যা এবং কবিতাপত্রিকার সংখ্যা (স্বল্পায়ু হলেও) ক্রমবর্ধমান। তথাকথিত এই সব পত্রিকার সম্পাদকদের নিষ্ঠা ও সাধনা বিস্ময়কর হলেও এ সময়ের নিরিখে কিছুটা Anachronistic বা কালানুচৈত্য-এর আবহ সৃষ্টি হয়। নিজস্ব সামান্য আর্থিক সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করে যান কোন্ জাগতিক বা পারমার্থিক প্রত্যাশায়, তা আমরা জানি না—যখন যে কোনো মূল্যেই অর্থ উপার্জনের দৌড়ে সকলেই দ্রুতধাবমান। ঐ সব তথাকথিত লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে যেগুলির ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তারা কয়েকটি বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকেন। (অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই ছোট মেজো বড় বাণিজ্যপ্রভুদের প্রসাদধন্য হওয়ার দক্ষতায়); তাঁরা সুদৃশ্য সুমুদ্রিত সুসম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন—তাঁরা অবশ্যই নমস্য এবং অকুণ্ঠ সাধুবাদের যোগ্য। সেই সব পত্রিকায় কত না প্রসঙ্গ থাকে : নাটক-সিনেমাপ্রসঙ্গ-গল্প-উপন্যাস-সমাজতত্ত্ব-রাজনীতি ইত্যাদি। আমরা ধন্য হই। শিক্ষিত হই, জ্ঞানরাজ্যের আঙিনায় পা রাখার অধিকারী হয়ে উঠি। কিন্তু বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা লেখকদের বিন্দুপ্রমাণ সাম্মানিক মূল্য দিতে বড়ই অনীহ।

কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি—এ পৃথিবী এখন তত্ত্ববিশ্বের বদলে তথ্যবিশ্বের নাগরিক হতে আগ্রহী, বলা উচিত, অতি তৎপর। কারণ এই যুগ তত্ত্ব-নিয়ম-নীতি-আচরণের ভগ্নস্তূপে পা রাখতে ঘৃণা বোধ করে। যাঁরা সেই ভগ্নস্তূপে অভিনব কিছু আবিষ্কার করতে চান—তাঁরা সেই ভৌতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়ে 'থিসিস' লিখে ধন্য হোন। আমরা বরং ঘটনার বিবরণে আপ্লুত হই সে ঘটনা খুন-ধর্ষণ-শিশু ও নারী পাচার ইত্যাদির ক্রমিক কাহিনি যাই হোক না কেন। চোখ রাখি টিভি সিরিয়ালের রবারের মতো টেনে দীর্ঘতর করা কাহিনি নির্মাণের সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য ঘটনার দৃশ্যপটে।

বিশ শতকের সাহিত্য বা শিল্পতত্ত্বে যাঁরা প্রাণিত হয়েছেন—এই একুশ শতকের গণমাধ্যমের বিশাল বৈচিত্র্যে, তাঁদের ধ্যান-ধারণা আজ প্রায় ফসিল হতে বসেছে। কমপিউটারের প্রবল প্রসার এ সময় মানুষের যোগাযোগের মাধ্যমে বিপ্লব উপস্থিত করেছে, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। প্রথমটি এ প্রযুক্তিতে অনভিজ্ঞ, সে কারণেই এই দ্রুতধাবমান সমাজে ব্রাত্য এবং অপাংক্তেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষেরা এস.এম.এস, ই-মেল, ইন্টারনেট, টুইটার-ব্লগ-ফেসবুক ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজেদের বিশ্বনাগরিক পর্যায়ে উন্নত করেছেন; কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত বিষয়ের প্রচারে যতটা আগ্রহী, দেশের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষদের কুসংস্কার (ডাইনি নিগ্রহ, মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মাতার প্রতি অত্যাচার-গঞ্জনা, এমনকী বাড়ি থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি) সম্পর্কে আদৌ উৎসাহী নন, কিন্তু এ সব প্রসঙ্গে যদি রাজনীতির ছোঁয়া থাকে, তাহলে তাঁরা সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাধে কি গণমাধ্যম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান বহুকাল আগে বলেছিলেন, "Medium is the message, not the content of the medium."

আসলে প্রযুক্তির ধারক-বাহক অংশ আর্থ সামাজিক স্তরে উন্নত—যাকে বলা হয় upper middle class-এর মহান ব্যক্তি। তাঁদের কি গ্রামগঞ্জের কুসংস্কার, এমনকী শহর ও শহরতলির দুর্বৃত্ত ও অমানুষদের কাণ্ডকারখানায় মাথা ঘামানো মানায়? তাঁরা বরং ফিল্মি-দুনিয়ার মহান সেলিব্রিটি নিয়ে মশগুল থাকুন। এই পরিবেশে সাহিত্য-কবিতা-সামাজিক ভাবনা চিন্তার ধারক ও বাহকদের মতামত গ্রাহ্য করার সময় বা সে সম্পর্কে মনোনিবেশ অসম্ভব প্রস্তাবনা।

পরিশেষে প্রবল বিতর্ক ও বিরোধিতার ঝুঁকি নিয়ে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, গত এক দশক ধরে আমাদের মহান ভারত এবং অবশ্যই প্রগতির বাণীবাহক পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির অবস্থাটি, দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমের সঙ্গে প্রতিতুলনা খুঁজে পাচ্ছি—যখন গ্ল্যাডিয়েটোরিয়াল, নৃশংস দৃশ্যপটে, রোমান জনতার উত্তেজনা ছিল আকাশস্পর্শী।

উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ একটি বিনির্মিত কূটাভাস

দেবীপদ মুখোপাধ্যায়

হতে পারতো এটা একটা যৌগিক উপপাদ্যের বাতিল খসড়া। হতে পারতো মীমাংসার যোগ্য বা যথার্থ বলে প্রমাণ করতে চাওয়ার একটা দুর্বল প্রচেষ্টা, কিন্তু প্রকৃতার্থে তা না হয়ে, হয়ে উঠল উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষায় স্মৃতিমৈদুরতা আচ্ছন্ন আধুনিক বাংলা কবিতার ক্রমক্ষয়িত ধারার এক সন্ধিকালীন আলোকণার প্রক্ষেপণ। যাকে বলা যেতে পারে গত শতাব্দীর ষাট সত্তর পরবর্তী এক নতুন অধুনান্তিককালের সূচনা। যার তীব্র আলোর বিকিরণে ক্রমশই ছিটকে যেতে শুরু হল বিশেষত সত্তরের সেইসব প্রান্তিক কবিদের, মাইনর ও গ্রেট মাইনরদেরও।

সত্তরের সেইসব অশ্বারোহীদের মধ্যে ক্রমে পিছিয়ে যেতে থাকাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং পরবর্তী নতুন অশ্বারোহীদের সম্মুখভাগের অংশ দেখতে দেখতে এক সময় মাঠের দখল নিয়ে নিলো পতাকা উড়িয়ে।

ফলতঃ যা হলো, আধুনিক বাংলা কবিতার এতদিনের সাধের লালিত শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প, প্রতীক, উল্লাস, সর্বোপরি আঙ্গিকের বাগান শুকিয়ে গেল।

অন্যদিকে একচেটিয়া পুঁজির বিকাশ এবং বিশ্বায়ন জনিত কুফলগুলির দ্রুত বিস্তারে মধ্যমেধাদের বাজার অর্থনীতির ঘূর্ণাবর্তে ঢুকে পড়া, মেট্রোপলিসের ঝাঁ চকচকে জীবনের গাড্ডায় পড়ার জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই সবের মধ্যে কোন ফাঁক দিয়ে কখন যে সান্ধ্যভাষার সেইসব মর্মঘাতী, মন ভাল বা খারাপ করা কবিতার লাইনগুলো উত্তর দক্ষিণের প্রত্যন্তে বা শহরবিমুখতায় সত্যি সত্যি প্রান্তিক হয়ে গেল, তার খোঁজ আর কেউ রাখলো না।

আমরা অনেকেই হয়তো এই নির্মমতার, উপেক্ষা আর অপমানের শরিকী বিবাদে বৃথা কালক্ষেপ করে এসেছি। ক্রমশ দখলচ্যুত হয়েছি পরবর্তী অগ্রগামীদের কাছে।

একদা যেমন শ্রমজীবী মানুষের একটা আদর্শ বা লক্ষ্যগত ঐক্যভিত্তি ছিল, সেখানে, রাজনীতিও ছিল। সে ভুল হোক বা ঠিক হোক।

কিন্তু দ্রুত শ্রেণী বিভাজনের এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যেমন তারাও আজ পরস্পর সমভাগী বা সহভাগী নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক এবং ছোটখাটো বৃত্তের মধ্যে ঘুরে চলেছে। পৃথিবীর এই কোণেও আজ তথ্যপ্রযুক্তি মেধাসত্ত্বের কারবারিরা উন্নত, বিলাসপূর্ণ জীবনের জন্যে হাজির করছে নিত্য নতুন কাজের ভাণ্ডার, সেখানে আজ দ্রুত বিপণনের জন্যে শুরু হয়েছে দৌড় প্রতিযোগিতা। যেখানে কোন আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক

নেই, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নেই। সেখানে শুধু মল, প্লাজা, মাল্টিপ্লেক্স আছে, হাইওয়ে আছে, ফ্লাইওভার আছে কিন্তু স্কাইলাইনের মাথার ওপর সেখানে কোনো চাঁদ নেই। শহরে পূর্ণিমা হয় না, প্লেগ বা কালাজ্বর হয় না। খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়। তাই, এসব পুরনো, তুচ্ছ ব্যাপার। কালচার শব্দটাই আজ ক্লিশে। শুধু কবিতার জন্যে এখন আর কেউ অমরত্ব তাচ্ছিল্য করে না।

আজ উত্তর আধুনিকতা শব্দবন্ধটির অন্বেষণ করতে গিয়ে যে তাত্ত্বিক সংহতি ও যুক্তি বিন্যাসকেই ভর করতে হয় তাতে ধীর ও অবিচলিতভাবে একটি ব্যক্তিগত ধারণা সঞ্জাত বিনির্মাণের অবভাস বা কুটাভাস সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার আমি এর প্রবক্তা নই, গূঢ়তত্ত্ববেত্তাও নই। আলুথুসরি থেকে ফুকো, দেরিদার বিনির্মাণতত্ত্ব থেকে নতুন কোন বিনির্মাণের চেষ্টাতেও নেই, কিন্তু আজ এই আধুনিক বাংলা কবিতার ভাসানযাত্রার গান যাঁরা গাইছেন তাঁদের প্রতি আমা হেন গাড়ল, মূর্খদের কোন প্রতর্কের অবকাশ থাকতে পারে কি? যারা তাদের সারা জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েই বেঁচে রয়েছে। আজ এই দুঃসময়ে সেইসব কবিদের কি করে তারা ভুলে যাবে? তা সে যতই হোক আত্মজৈবনিক, স্বীকারোক্তিমূলক, লিরিক্যাল কিংবা গীতিকবিতা।

আজ কি করে আমরা অস্বীকার করি আমাদের দিনরাত্রি জুড়ে ছিল সুনীল-শক্তি-শঙ্খ ঘোষ-বিনয়-উৎপলদের কবিতারা। তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল আমাদের চলাফেরা, বদলে গিয়েছিল আমাদের জীবনযাপনের কিছুটাও, যা অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করেছিল আমাদের কালের কবিদের কবিতাকেও। পরে অবশ্য অনেকেই তার থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। প্রচলিত ধ্যান ধারণা, অমিত জ্ঞানের বর্জ্যগুলিকে পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক কবিতা জগৎ খুলে গিয়েছিল তরুণ কবি পাঠকদের সামনে। ক্রমশ আলোচিত হতে শুরু করেছিল সত্তরের প্রধান কবিরা। অর্থাৎ সেই কালের উত্তরাধিকারীদের কাছে ওই অগ্রজ কবিদের কেউ কেউ তখনই আইকন হয়ে উঠেছিল আর বাকিরা ক্রমশ ফিকে হচ্ছিল। এই অসম গ্রহণবর্জন থেকেই শুরু হয়েছিল অধুনান্তিক বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ নতুন এক যাত্রাপথ, যা নিয়ে মলয় রায় চৌধুরী তাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন, তা নিয়ে, মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু না মেনে উপায় নেই। যেমন 'মডার্ন' কবিতা যুক্তির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কবিতার কাঠামোয় আদি-মধ্য-অন্তকে মান্যতা দেয়। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো কবিতা এগোয়। কবিতার মধ্যে সূচনা বিস্তার আর উপসংহারের অস্তিত্ব থাকে। এই মিলোলোয়েস্টিক প্যাটার্ন বা যুক্তি কাঠামোর মধ্যে দিয়ে কবি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান (মনে করেন পৌঁছে যান)। কবিতার ধ্রুবক নিশ্চিত থাকে। অধুনান্তিক কবিতায় এই অনুক্রম অনুপস্থিত থাকে। কবিতাটি ক্লোজ এন্ডেড (বদ্ধ সমাপ্তি) হয় না। বরং ওপন্ এন্ডেড (মুক্ত সমাপ্তি —কবিতা শেষ হলেও মনে হবে হয়নি, যতির বদলে ডট বা ড্যাশ থাকে) হয়। এখানে পাঠকদের যথেচ্ছ ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকে। নিজস্ব আবিষ্কারের দিকে তাকে ঠেলে দেওয়া হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় ক্লোজ এন্ডেড কাঠামো পরিষ্কার। উৎপলকুমার বসু এক সময় বদ্ধ সমাপ্তির কবিতা লিখতেন। এখন মুক্ত সমাপ্তির কবিতা লেখেন। যুক্তি কাঠামোর ধার ধারেন না বলে বিশেষ কোন মানে ধরে এগোনোর দায় থাকে না পাঠকের। তাঁর সামনে অসীম সম্ভাবনার জগৎ খোলা। তাঁর কথায় একজন কবি এই সময়ের হয়েও আধুনিক, উত্তর আধুনিক এমনকি প্রাক আধুনিক কবিতাও লিখতে পারেন। তার উদাহরণ হিসেবে ২০০১ সালে রচিত বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৎস্যগন্ধা কবিতাটির কিছু অংশ তুলে বোঝাতে চেয়েছেন যে, কবিতাটির কাঠামোটি প্রাক আধুনিক হলেও কবির প্রয়াসটি উত্তর আধুনিক। এই কথার সমর্থনে ষাট-সত্তরের অনেক কবির কবিতা উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে। তাই শুধু পোস্ট মডার্ন কবিতাই যে কোন সীমাকে ছাপিয়ে যেতে চায় তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সহমত হওয়া গেল না। অনেক আধুনিক কবিকেও কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ধরে রাখা যায়নি। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যিনি পঞ্চাশের দশকেই ছন্দের বারান্দা অতিক্রম করে আধুনিক কবিতার ট্রাডিশন ভাঙতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ তখনই তিনি অধুনান্তিক হয়ে উঠেছিলেন। তার কবিতার পাঠবস্তু নির্মাণ, শব্দের ব্যঞ্জনা এমনকী চিত্রকল্প এবং ছন্দও সেই সময়ের তরুণ কবিদের আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তা আজকের এই উত্তরাধুনিককালের অনেক কবির কবিতাতেও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

সেই হিসেবে শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন, আলোক সরকার, উৎপল বসুরা সেভাবে পরিবর্তীদের কবিতায় প্রভাব ফেলতে পারেননি।

আজ আমরা যে চার দশক পার হয়ে এসে পড়েছি সম্পূর্ণ নতুন অভাবিত, জটিল এক সময়ে, যে সময়ের কবিরা অতীত, ইতিহাস না ঘেঁটেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন এবং একটা নতুন বুনন পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের আর উপেক্ষা করার উপায় নেই।

কিন্তু এ কথা কি মেনে নেওয়া যায় যে, 'আধুনিক কবি তার ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করেন (তার মানে লোকটা কবি সাজে)। অথচ কুলি, চাষি, রিকশাঅলা, গৃহবধূ, ভিকিরি সকলেই অধুনান্তিক কবি, কেননা তাঁরা যা লিখবেন তাই কবিতা ...' বলেছেন মলয় রায় চৌধুরী। তাঁর দেওয়া উদাহরণের বাইরে এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় যাকে অধুনান্তিক বা পোস্ট মডার্ন কবিতা হিসেবে এক কথায় বলা চলে। সম্প্রতি (২০১০) একটি সাহিত্য ও না-সাহিত্য বিষয়ক প্রয়াস 'না' নামক পত্রিকার সূচনা সংখ্যায় বর্তমান প্রজন্মের এগারোজন কবির কবিতা এবং সেই সঙ্গে পাঁচটি প্রশ্নোত্তর রেখেছেন। যাঁদের সকলেরই জন্ম আটের দশকে। পরিচিতি থেকে জানা যায়। অনূর্ধ তিরিশের এই কবিদের অনেকেই থাকেন গ্রাম অথবা মফস্সল শহরে। তবু কলকাতা কেন্দ্রিক কবিতাচর্চার থেকে তাঁরা যে অনেকটা দূরে রয়েছেন, তেমনও নয়। কবিদের অনেকেই শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে জীবিকা সূত্রে জড়িত। অন্যরা হয় ছাত্র কিংবা অন্য মাধ্যমে কাজ করেন। পাঁচটি প্রশ্নের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—আপনার সময়কালে যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের মধ্যে একজনের কবিতা আপনাকে আরও ভালো কবিতা লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে কি? তাঁর নাম ও তাঁর কবিতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

এগারোজন কবির মধ্যে দু'জন—রঙ্গীত মিত্র ও অভিজিৎ মণ্ডল বলেছেন 'বিশেষ একজন কারও নাম বলতে পারব না।'

বাকিদের মধ্যে একজনই শুধু, নাম সাগরনীল রায় পঞ্চাশের কবি উৎপলকুমার বসুর নাম করেছেন। অন্যান্যরা যাঁদের নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে জয় গোস্বামী ও শ্রীজাত ছাড়া বাকি সকলেই পাঠকদের কাছে ততোটা পরিচিত নয়। মানস চক্রবর্তী বলেছেন মুকুন্দ মাজির নাম। যাঁর কবিতা পড়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। হুগলীর সিঙ্গুর ব্লকের বারুইপাড়ার কবি মুকুন্দ মাজি। বয়সে যিনি মানস চক্রবর্তীর চেয়ে ছোট। কাজ করেন বড়বাজারের এক গদিতে। মানস বলেছেন—তাঁর কবিতা আমাকে ভীষণ টানে। আজকাল কবিতা ক্রমশ শহর কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিলাস হয়ে উঠেছে, যেখানে মুকুন্দের কবিতা ভীষণ জীবন্ত। কবিতায় যে শ্রেণীর কথা বলা উচিত বলে আমি মনে করি, মুকুন্দ মাজি তাঁদের কথা বলেন।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ পরবর্তী সুদীর্ঘ কবিতা কালের মধ্যে শুধুমাত্র ৫০ দশকের মাত্র একজন কবির নাম উঠে এলো! বাকি সকলেই পঞ্চাশ পরবর্তী। তাদের মধ্যে জয় গোস্বামী, শ্রীজাত, বিশ্বনাথ গরাই ছাড়া বাকিদের নাম পর্যন্ত জানি না।

এর থেকেই যা বোঝার বুঝে নিতে হয়। আধুনিক কবিতার কিন্তু এই নিষ্ঠুর পরিণতি তাই আজো আমরা অনেকেই মেনে নিতে পারছি না। মেনে নিতে পারছি না, তাই হয়তো কষ্টও হচ্ছে। এ এক নিরুপায় যাত্রা। যাঁদের কবিতা পড়ে আমাদের কবিতা চর্চা শুরু হয়েছিল, তাঁদের অস্বীকার করি কীকরে? তাঁদের স্বীকার করেও তো মুক্ত ভাবনার কবিতা চর্চা করা যায়। উপরোক্ত আলোচিত 'না' পত্রিকার সম্পাদক ওই সংখ্যার না-সম্পাদকীয়তে লিখেছেন 'সিরিয়াস

সাহিত্য বাংলা ভাষায়, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে উঠছে ... কবিতার ক্ষেত্রটিও তেমন। জীবিতকালে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিনয় মজুমদারের যত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, আজকের কবিরা মাত্র দু-পাঁচ বছরেই তা ছাপিয়ে যান। প্রশ্ন হলো এত বিপুল রচনায় কি মানের উত্তরণ ঘটা সম্ভব?'

তাই অধুনান্তিক এই কালখণ্ডটিকে মেনে নিতে বাধ্য করছে মিডিয়া শাসিত ভাষা-সংস্কৃতি। যার সর্বগ্রাসী হাঁ-মুখে আজ হাত তুলে ঢুকে পড়ছে মধ্যমেধার বিত্তবান থেকে নিম্নবর্গীয় সকলেই। তাদের জন্যে আমাদের মাথাব্যথা হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ তাদের জন্যেই তো রইলো উত্তর ঔপনিবেশিক, উত্তর আধুনিক ছলাকলার বিশাল জগৎ—বিপন্নতা অন্যত্র, একুশ শতকের অতিক্রান্ত প্রথম দশকের পরে আজকের এই দুর্বিষহ, বিপন্ন সময়ে আমাদের মতো প্রান্তিক ও পরিত্যক্তদের জন্যে তাহলে কি রইলো? উত্তর আধুনিক কূটকচালি চলতেই থাকবে, বিদ্যার্থীও শিক্ষকদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তেই থাকবে, পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে, রাজনীতি, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে মিডিয়া চাতালে ভিড় বাড়বে—শুধু তিন চার দশক পেরিয়ে আসা অন্তরালের কবিদের জন্যে হয়তো থাকবে উল্টো দূরবীন কিংবা না-এর মতো পত্রিকার আহ্বান।

আমাদের বিপন্নতা শুধু এক উত্তীর্ণ সময়ের সঙ্গে বর্তমানের সংঘাতের প্যারাবোলায় নয়, আমাদের বিপন্নতা বোধ আর অনুভূতির ক্ষয়ের জন্যে, আমাদের বিপন্নতা ভাষা হারানোর ভয়ের জন্যে, সাদা কাগজের ওপর মনখারাপ করে পড়ে থাকা কলম আর কাঁপতে থাকা আঙুলের জন্যে।

ছায়ামারীচের বনে একা একা

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

''আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো : 'এই জীবন নিয়ে তুমি কী করেছো এতদিন?'—তাহলে আমি বলবো...''

কিছুই করিনি। বুনো গাধাদের ডাক শুনতে শুনতে অনর্থক শব্দ জুড়ে গেছি এতদিন। অদেখা স্বপ্নের পিছনে লাট খেতে খেতে গোত্তা মেরেছি ভুল গানে, ভুল সুরের আবহে। সে আসি আসি করে চলে গেছে দূরে। আমি খুঁজি তাকে কোনো ঝুপড়িবাসীর ঘরে। কোনো দীর্ণ চাষির কিণাঙ্কে। শাসকশ্রেণীর দম্ভে। বিরোধীদের মিথ্যাচারে। কোনও চটক লাগানো ভ্রূপল্লবের ইশারায়। চন্দনের বনে নয়, ঝাঁ চকচকে শপিংমলের চলন্ত সিঁড়ির উপর দাঁড়ানো ঈষৎ উন্মোচিত সৌন্দর্যের দৃশ্যমান বিভাজনী রেখায়। কখনো বা বহুদূর বিস্তৃত পর্বতমালার উচ্চাবচতার ছায়া ছায়া দৃশ্যমানতায়। সেখানে পৌঁছয় না আমার চিৎকার। অর্থহীন অক্ষরমালার অহংকার।

''হৃদয়ে আমার গন্ধের মৃদুভার
তুমি নিয়ে চলো ছায়ামারীচের বনে...''

আপাদমস্তকপ্রমাণ এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভেঙচাই। নিজেকে। আয়নাটা বড় হতে হতে ব্রহ্মাণ্ডসমান হয়ে যায়। আমার মুখের মঙ্গোলয়েড ছাপে আর্যত্ব খুঁজে হয়রান। কেমনতরো ছাঁদ। অক্ষরবৃত্ত/মিশ্রকলাবৃত্ত/তানপ্রধান, স্বরবৃত্ত/দলবৃত্ত/শ্বাসাঘাতপ্রধান, মাত্রাবৃত্ত/কলাবৃত্ত/ধ্বনিপ্রধান? শুনতে পেলাম—''দেবীপক্ষের শুক্ল পাখিটি আমাকে বলছে 'নিজের ছায়াকে পার হয়ে যাও' ... '' কীকরে পেরবো। পথ খুঁজে চলি। খুঁজতে খুঁজতে আয়নাটা ঘর হয়ে যায়।

ওই ঘরের মধ্যেই ছুটে বেড়াচ্ছে সব ছোট বড় মাঝারি অক্ষরকর্মীরা। সন্ধেবেলা এক পলিতকেশ কবি অপেক্ষাকৃত তরুণের সঙ্গে মদ খেতে খেতে চেঁচাতে থাকেন ঃ 'আমিই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম...' মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাচ্ছে অন্যজন। অঙ্ক হেঁটে আসে। অঙ্ক হিসেব করে দিন ভাগ করে। ঘন্টা। মিনিট। শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলো। কার জন্য কতটুকু হাসি, কতটুকু দাঁত ফাঁক, সবই অংক কষে কষে। রোজনামচায় ঢোকে সপ্তাহের কোন দিন কার বাড়িতে হাজিরা দিতে হবে। দিতে হবে তেল ও মাখন কিম্বা অন্য কোনো কিছু। কোন চেয়ারের কাছে নতজানু আড়ালে-আবডালে। কীভাবে তোল্লা দিতে হবে অপটুজনকেও নিজপ্রয়োজনে। যদি একটা ফ্যান ক্লাব হয় অথবা একটা বিশেষ সংখ্যা শুধু তাকে নিয়ে। আয়না দেখাচ্ছে; শিখছে বালক। সদ্য এম বি এ। শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রকৌশলী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্তিম বছরের ছাত্র/ছাত্রী। রাজনীতি থেকে কাব্যের অঙ্গনে আসা ধূর্ত শিকারী। মেধাবী আমলা। গালকাটা ফেলু। বারদুয়ারীর দীনু ময়রাও। সব এসে ঢুকে যাচ্ছে ওই মহা কাচের ভিতর। নিতান্ত অপটু হাতে বাজাচ্ছে কেউ পূর্বী রাগ মোমের এস্রাজে। আহা আহা মাথা দোলাচ্ছে লোকজন। 'উনি কে জানেন? কত বড় নেতা।' 'অঃ তাই বুঝি। নেতা মানেই তো সর্ববিদ্যাবিশারদ।'

''খণ্ডে খণ্ডে আত্মচরিত লিখে যাওয়া ছাড়া/এখন আমার আর কোনও কবিতা নেই/খাওয়া-ঘুম-পায়খানা আর দু-নম্বরি বাংলা-খবরের-কাগজ ছাড়া/কোনও দিনযাপন আজকাল কবিতায় এরকম/একটা চল হয়েছে বটে কিন্তু দু-একজন/ফাঁপানো-বেলুন/চুরুট খেতে-খেতে গম্ভীর গলায় প্রয়াত এক কবিবন্ধু/বলত গদার জানে জিনিষটা কী এবং কেমন করে...''

''ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা''-এঁকে অনুকরণ করে কেউ একজন ওই সময় আধাবিখ্যাত প্রায় হয়ে পড়েছিল। আনন্দে ও গর্বে সে অনন্তশয্যায় শুয়ে শুয়ে এখনও ভেবে চলেছে 'আমিই এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম...' তার প্রতি মাথা নাড়ানোর জন্যও রয়ে গেছে কিছু অঙ্কের শিক্ষক। দরকার নেই কিছু পেরনোর। সঠিক খুঁটিটি চাই। চাই অভিনয়ের ক্ষমতাও। নইলে সঠিক সময়ে অসুস্থ হতে পারবেন কীকরে? অন্যদের পড়া পণ্ড করে কীকরে কবি সভায় কেড়ে নেবেন সকলের মনোযোগ? সঠিক খুঁটির সঙ্গে এই অঙ্কও চাই, তবেই না জল আসবে বাঙালির চোখে।

''আশীর্বাদ করি আজ, পৃথিবীর মানুষেরা, তোমাদের
সব্জির বাজার যেন সবুজ পালংশাকে ভরে ওঠে...''

পালংশাক তো দূরস্থান, একটা কাঁটা পেলেও চলবে এখন। দেহের দূষিত রক্ত বার করতে ওটারই ভীষণ প্রয়োজন আজ। ''মশারির চারদিকে ফুটো/এ আমার এ তোমার পাপ/শুধুমুধু আড়মোড়া ভাঙো-/বিছানায় শাঁখামুটি সাপ।''

তো, আমার দশকেরই এক বিখ্যাত কবি একদিন আমায় বলেছিল ঃ 'তোমরা তো সব শাঙ্খ হয়ে আছ। তুমিও। সৌজন্য ও বন্ধুপ্রেম হেতু আমি তাকে বলতে পারিনি যে, তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই; আমরা সকলেই শাঙ্খ, কিন্তু সে যা এখন লিখছে তা জীবনানন্দীয় কী? একটু আত্মবিশ্লেষণ করে দেখুক। সাধের মশারির চারদিকে ফুটো। মশা ঢোকে অগুন্তি। ঢোকে শাঁখামুটি সাপ। এরা নির্জনে আপনার লেখার প্রশংসা করবে। জনসমক্ষে তো চিনতেই পারবে না; যদি না আপনাকে দিয়ে তার বড় কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

''ছড়াও তোমার ডানা আমি মুগ্ধচোখে দেখি তোমার বিস্তার/শোনাও তোমার গান আমি ছবি আঁকতে চাই শুধু/গলায় ক্যামেরা নেই, তুমি জান চাই না তোমার ফটোগ্রাফ/চাই না আলোকতত্ত্ব নিয়ে কোনো আলোচনা/করুণ ঘুঙুর শুধু পায়ে বাঁধা—আজ আমি বাগানে এসেছি।''

ওদের ডানা বিস্তার দেখে যাচ্ছি মুগ্ধ চোখে। দেখেছি কীভাবে আমাদের অক্ষরেরা উপেক্ষিত হয়; আর একই অক্ষরমালা তার বহুদিন পরে ওরা কেউ লিখে দিলে সাড়া পড়ে যায়।

''ঘর অন্ধকার/চোখে চোখে জ্বলে ওঠে আলো/যে আলো দেখার নয়/না দেখেও দেখা যায় ভালো'' না দেখেও যা ভালো তা দেখার জন্যই এ পরিভ্রমণ। ভালো লাগবে না-এরকম ধরে নিয়েও এই পথ চলা। আর পথের উপান্তে পড়ে থাকা-''ধরো, সে কবিতাখানি নীল তার চারপাশে সোনালি রেখার কারুকাজ/

.ভাবো, সে ছুটিতে আসা হাওয়া বাতাসের প্রায়, তুমি তাও/অবয়ব আশা করেছিলে ভ্রমে, যেন তুমি কথপোকথনকালে/ চেয়েছিলে করতল ছুঁতে। অবাক উছলা সেও ছুটেছিলো মাঠের ওপর...”

আর আমিও ছুটে চলেছি ওই মাঠের উপর। অধরা সে...

“কেমন আছেন?/জিজ্ঞেস করতে/কবি ছড়িয়ে পড়েন/চাঁদের আলোয় মনে হয়/শত শত কবি ফুটেছে”।

বিস্ফারিত চোখে দেখছি তাদের। দেখছি ওদের ছলা-কলা। তারুণ্যের জয়গানে মত্ত আমরা, আর ওরা অহংকারে ডগমগ। একজন তো লিখেই ফেল্ল ঃ ৭০ এর কবিরা কেউই ততটা প্রতিভাশালী নন। আমি অবাক হইনি। আমরা অগ্রজকে সম্মান দিয়ে নিজের নামটাকেও সামান্য পরিবর্তন করে আজীবন কুমারত্ব নিয়েছি, অথচ আমাদের এক অনুজ দিব্যি আমার নাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাকে প্রশ্রয় ও সমর্থনে পুষ্ট করছেন আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত এক অনুজ কবি এবং ৮০রও কেউ কেউ। কিন্তু সেই ধ্বনি?

“উঠে এসো, যেভাবে কল্লোল থেকে উঠে আসে ধ্বনি। আমার অসংযমের অক্ষরে/যদি তুমি ছিলাটান দাঁড়িয়ে ওঠো, আর একটি ছন্দের ডানা স্থাপন করো/ শূন্যের নীলিমা থেকে আমি তোমাকে দেখতে পাব অন্য এক পৃথিবীর/অনন্য উপমা।”

কে কার উপমা? ছায়ার উপমা আমি, না আমার উপমা ওই ছায়া। সারাক্ষণ খুঁজে চলা ছোট হয়ে যাওয়া সংসারে। এখন তালুতে ব্রহ্মাণ্ড দাঁড়িয়ে। আমার প্রেমের সার্চ গুগল ইঞ্জিনে।

“আমাকে দিয়েছ তুমি নিঃসীমে ওড়ার জন্য দুর্বিনীত ডানা/... উড়ে শেষে নামব কোনো ফাঁকা হ্রদে, পাতা থাকবে জলের বিছানা।”

অক্ষরেরা স্বপ্ন হয়ে উড়ে যায় আর সেই স্বপ্নের মধ্যেই আমার বিচরণ। আমি সুদর্শন নই। অঙ্ক, মার্কেটিং জানি না। অভিনয় করতে পারি না। এম বি এ, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, চিকিৎসক নই। কোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মিডিয়ার সঙ্গে পরিচিতি নেই। পায়ের জোর নেই। তেল-মাখনের পয়সা নেই। শুধু স্বপ্ন আছে। তা-ও ভাঙাচোরা। কীভাবে ধরব ওই অক্ষরগুলোকে, এনিয়েই আমার সমস্ত আকাশ। সমস্ত জীবন ধরে শুধুমাত্র একটা কবিতাই নির্মাণের চেষ্টা করে যাওয়া। এই গদ্যটিতে আমি জয় গোস্বামী, বিশ্বনাথ গরাই, উজ্জ্বল সিংহ, রণজিৎ দাশ, ভাস্কর চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, তুষার রায়, শ্যামলকান্তি দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, অমিত চক্রবর্তী, রাণা রায়চৌধুরী, গীতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের কবিতাংশ ব্যবহার করেছি। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই ঠিকঠাক চিনে নিতে পারবেন।

“এইবার নামি চলো, সময় হয়েছে। ফিটফাট/পেরোলাম ঢের লৌহ-শতাব্দীর কংক্রিটের ব্রিজ,/এবার স্বভাবগুল্ম সিঁড়ি ভাঙি, ওখানে মারীচ/ সবুজ বিপ্লব শেষে দোফসলে ছাড়েনি তল্লাট।”

কবিদের উৎসব

রমেন আচার্য

যাঁরা এতদিন ছিলেন বই ও পত্রপত্রিকার পাতায় অক্ষর ও শব্দের আড়ালে, হঠাৎ তাঁদের সামনে দেখার সুযোগ এলো। বর্তমান সময়ে এটা নিশ্চয়ই বিশেষ খবর নয়, মিডিয়ার দৌলতে মানুষ এখন পৌঁছে যাচ্ছেন লেখকের অন্দরমহলে। সিনেট হলের সেই বিখ্যাত কবি সম্মেলনের শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে আমরা সেদিন তাই কৃতজ্ঞ ছিলাম উদ্যোক্তাদের কাছে। এতদিন যারা অচেনা পাঠক, আজ তারা চোখের সামনে কৌতুহলী ও উৎসাহী শ্রোতা—এই অনুভূতিও নিশ্চয় কবিদের কাছে সেদিন এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে নানা শহরে ও মফস্বলের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে কবিসম্মেলনের এই প্রবনতা। মানুষ যখন নানা ছোট-বড় উৎসবে মেতে উঠতেন, কবিরা তখন যেন সকল লোকের মাঝে বসে নিজের মুদ্রাদোষে কিছুটা আলাদা হয়ে যেতেন। কবি সম্মেলন তাই তাদের নিজস্ব উৎসব হয়ে উঠল। যখন একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপন্ন মনে হতো নিজেকে, দীর্ঘদিন একলা চলতে চলতে কবিসম্মেলনে এসে অনেক ‘একলা’-র মিলনমেলায় তৃপ্তি পেয়ে সেই নিঃসঙ্গতাবোধ কাটলো। লেখার পরে সেই কবিতা কাউকে শোনানোর জন্য ব্যাকুলতা, অথচ শ্রোতা কোথায়? কবি সম্মেলনের মঞ্চে অনেক কবি ও সামনে অনেকে, তাদের সকলের সামনে কবিতা পড়ার সুযোগ করে দিলেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু কবিতা পাঠের পরে তার প্রতিক্রিয়া কেমন? দেখা গেল, কিছু কবিতা যা কাহিনিযুক্ত, আবেগময়, সোজাসুজি উচ্চকণ্ঠ বক্তব্য—তা শ্রোতাদের করতালিতে অভিনন্দিত হলো। অথচ নিম্নকণ্ঠ সূক্ষ্ম অনুভূতির কবিতা শ্রোতাদের তো নয়ই, পাশে উপবিষ্ট অন্য কবিদের মধ্যেও তেমন সাড়া জাগালো না। বিপন্ন কবি তখন ভাবতে থাকেন—এই অসম্মান সত্যিই তার প্রাপ্য ছিল কিনা।

এই ভাবনার শরিক আজ আমরাও। দিকে দিকে এরকম কবিসম্মেলন, পাঠক-শ্রোতাদের সঙ্গে কবি সমাজের একটা পারাপারযোগ্য সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে কবিতার প্রসার হয়তো ঘটছে, কিন্তু কোন কবিতার? আবৃত্তিমঞ্চের কবিতায় মুগ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে যখন কোনো শ্রোতা বিখ্যাত কোনো কবির বই কিনে ফেলেন, তখন একজন শ্রোতাকে পাঠক করে তোলার জন্য নিশ্চয়ই আবৃত্তিকারের ধন্যবাদ প্রাপ্য, কিন্তু সেই শ্রোতা যখন বইটির কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে গিয়ে দেখেন—হায়, সব কটি কবিতার প্রবেশপথে তালা ঝুলছে, দুর্বোধ্যতার তালা। প্রকৃতপক্ষেই কি তা দুর্বোধ্য, নাকি অনভ্যাসের মরচে পড়া ভুল চাবিতে তা খোলা যাচ্ছে না? তাহলে কবিতা সম্পর্কে শ্রোতার ওই মুগ্ধতা এসেছে কোথা থেকে? আবৃত্তিকারের কণ্ঠের জাদুতে, নাকি কবিতার উচ্চকণ্ঠ আবেগ ও নাটকীয় সমাপ্তিতে? কবিতার যে সহজ সরল বিষয় শ্রোতার উপলব্ধিতে আলোড়ন তুলেছিল তার মূল্য কি কম? স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে অশ্রু নেমে এসেছে হৃদয়মন্থন করে, তা কি মূল্যহীন হতে পারে? জনমানসে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া ও তাদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে এই পদ্ধতি তাই সফল। তবু কবিতার কাছে আরো বেশি কিছু দাবি থাকে কবিদের। যে সূক্ষ্ম ও গভীর বোধ স্নায়ুর আঁধারে স্পন্দিত, তাকে আলো-হাওয়ায় মেলে ধরতে কবিতা ছাড়া আর কে পারবে?

রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ায়—‘বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আর একটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা।’ আবৃত্তিকারকে বেছে নিতে হয়েছে যে মঞ্চসফল রচনা, হয়তো তা আসলে পদ্য মাত্র, পদ্য থেকে কবিতায় উত্তরণ ঘটে কবিতার যে শিল্পকলার জাদুতে, যে সূক্ষ্ম ও গভীর রচনাতীত অনুভব কবিতার সম্পদ, তা যুক্ত হলে স্বাভাবিক ভাবেই একবার মাত্র শুনে তা বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। কবিতায় একটি মাত্র শব্দের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক না-বলা কথা বা ব্যঞ্জনা, তা উন্মোচন বা আবিষ্কারের তৃপ্তি পান একমাত্র সৃজনশীল পাঠক। সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি—এই সত্যের পাশে উচ্চারিত হচ্ছে—সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক। শব্দের জানালা খুলে কবিতার অন্দরমহলের ঐশ্বর্য দেখার জন্য আমাদের বারবার কবিতার কাছেই ফিরে যেতে হয়। কবিতার এই অন্দরমহলের প্রবেশপথে যে তালা, তার নির্মাণের দিকে লক্ষ করলে দেখবো ওর মাথায় একটা বাঁকানো প্রশ্নচিহ্ন। সে প্রশ্ন করছে : ‘শ্রোতা আসলে কতটা পাঠক?’ শুধু পাঠক নয়, সৃজনশীল সংবেদী পাঠক, যিনি কল্পনায় কবির না-বলা বা অল্প বলা কথাকে নিজের কল্পনায় প্রসারিত করে কবিতার পুনর্নির্মাণ করে তৃপ্তি পান। এই ঐতিহ্য কবি সম্মেলনে বা কবিতা পাঠের আসরে কি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? সূক্ষ্ম

কবিতা অনাদৃত বলে কবিরাও কি প্রবল করতালিতে অভিনন্দিত হওয়ার আকর্ষণে প্রলুব্ধ হচ্ছেন না? নিজের লেখালেখির সময়ে পাঠকের পরিবর্তে শ্রোতাদের উৎফুল্ল মুখ ফুটে উঠে প্ররোচিত করছে কি কবিকে? বাংলা কবিতা কি সূক্ষ্মতার পরিবর্তে ঝুঁকে পড়বে সদ্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় শ্রোতাদের দিকে? সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মহাকালের বিচারের কথা বলা হয়, সেই না-দেখা, না-চেনা মহাকালের পরিবর্তে বর্তমানের সম্মান ও অভিনন্দন কবিদের কাছে বেশি আকাঙ্ক্ষিত?

কবি সম্মেলনে মিলিত হওয়ার সুযোগকে কি অন্য ভাবে অর্থবহ করা যায় না দর্শক ও শ্রোতাদের সংখ্যা না ভেবে? আমাদের প্রত্যেককেই মনে জেগে ওঠা নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের সামনে দাঁড়াতে হয়, অথচ সমাধান খুঁজে পাই না। এই বলতে শুনি—'সকলেই কবি নয় কেউ কেউ কবি' — তাহলে গুণপনায় একজন কবি, অন্যরা কবি নয়? এই নিয়ে আলোচনা ও আড্ডায় প্রকৃত কবিতার স্বরূপ চেনা যেতে পারে। কবিতা আসলে কী—এর উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয় এই বলে যে—কবিতার সংজ্ঞা হয় না। আসলে নানা রকম কবিতা ও তার বহু রকমের সংজ্ঞা। হোক না সে সব নিয়ে মতবিনিময়। বিগত দিনের খ্যাতনামা কবিদের সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনায় শিক্ষিত ও সতর্ক হতে পারি আমরা। আমন্ত্রিত যোগ্য আলোচকের মুখে শুনতে পারি জটিল কোনো কবিতার উন্মোচন। শব্দের জানালা দিয়ে কবিতার ভিতরের গোপন ঐশ্বর্যের খোঁজ পেতে পারি আমরা। আসলে সব শিল্পের জন্য শিক্ষালয় এখন সর্বত্র, অথচ কবিতা নিয়ে আমাদের স্বশিক্ষিত হতে হয়। কবিসম্মেলনে কবিতাপাঠের পাশাপাশি এরকম আড্ডা আমাদের ভাবনা বিনিময়ের ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। চারপাশে তো কত চড়ুইপত্র, কিছু কিছু পত্রিকা 'কবিতা পরিচয়'-এর মতো কবিতার অন্দরমহলের পথ দেখাতে পারে কোনো গভীর ও জটিল কবিতার আলোচনা করে। এসব তো খুব জরুরী। একশোটি মুদ্রিত কবিতার ৪/৫ টির বেশি ভাল কবিতা পাওয়া যায় না—এরকম অভিযোগ তাহলে হয়তো শুনতে হবে না। কবিতার উপরের স্তরের প্রাথমিক প্রাপ্তিই যে একমাত্র প্রাপ্তি নয়, উপরের স্তর সরিয়ে গভীরে নামলে কবিতায় যে অন্য রকম প্রাপ্তি ঘটে, এটা ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছে কবি সম্মেলনে একবার মাত্র পাঠ শোনার পরে। এই ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক না হলে, পদ্য থেকে কবিতায় উত্তরণে শিল্পকলার যে জরুরী ভূমিকা থাকে তা বিস্মৃত হলে কবিতারই ক্ষতি। কারণ এখনো সূক্ষ্মতম শিল্পমাধ্যম হলো কবিতা, তাকে পদ্যের সহজ ও রম্য বৃত্তে আবদ্ধ থাকলে চলে না। কল্পনার ডানা আমাদের জীর্ণ আকাশের ওপারে অন্য এক আকাশ চেনাক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের হাতে কবিতার বদল ঘটতে পারে, তবে সূক্ষ্মশিল্প বলে কবিতার যে উচ্চাসন, তা সমতলে টেনে নামানো ঠিক নয়। তরুণ ও নবীন কবিদের পথও যেন প্রকৃত কবিতার দিকে ধাবিত হয়।

সিনেট হলের সেই ঐতিহাসিক কবি সম্মেলনে সঙ্কুচিত লাজুক কবি জীবনানন্দের অস্পষ্ট উচ্চারণের কোনো স্মৃতি নেই, কিন্তু বর্তমান জুড়ে প্রতিমুহূর্তে আজও তো তিনিই আছেন, এবং থাকবেনও।

লেখার টেবিলের সামনে দেয়ালে শ্রোতাদের উল্লসিত করতালির দীর্ঘ ফটোগ্রাফ। সে দিকে একবারও না তাকিয়ে কবি কি ঘাড় গুঁজে লিখতে বসবেন কবিতা? নাকি পলকহীন তাকিয়ে থাকবেন দেয়াল জুড়ে 'মৃত্যুর আগে' কবিতার চিত্ররূপময় কয়েক পঙ্‌ক্তির দিকে—

'... যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোন সাধ নেই তার ফসলের তরে'।

ফরাসী, জার্মান কিংবা স্প্যানিশ ভাষার মূল ভাষ্যগুলি না হোক ... অন্ততঃ ইংরাজী অনুবাদেও এমনকি ... যে বাঙালী পাঁঠক-পাঁঠিকারা এখনও পাস্কাল, ভিগেনস্টাইন আর বোর্হেস পড়ে উঠতে পারেননি ... স্বপনরঞ্জনের এই গ্রন্থখানি যেন তাঁদের ক্ষমা করে...

রায় নীলোৎপল

(১)

''অ্যাই রিক্সা, এখান থেকে পড়লে মরে যাবো না?'' ('গান্ডু')

বেশ কিছুকাল পরে, আরো একটি পাঠযোগ্য বাংলা বই আমার জীবনে এলো। পূর্বলিখিত বাক্যখানির মধ্যে তলরেখধৃত শব্দদ্বয় প্রণিধানযোগ্য। কেননা, বর্তমানে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন সঙ্কট এই যে বিগত প্রায় অর্ধশতক যাবৎ বাঙালী পাঠক, 'কাহিনীকার' ছাড়া গদ্যে আর কিছুই পায়নি ... চারিদিকে শুধুই ফোকলা গল্পদাদুদের ভীড়। এর মূল কারণ, অনুভব করি, একটিই। আর তা হয়, তাবৎ বাঙালীর একটি অর্ধশিক্ষিত তথা অর্ধমনস্ক জাতিতে পরিণত হওয়া। বেশী দিন নয়, এই তো ২৩ থেকে ২৮ বছর আগেই মাত্র, বাংলার সর্বাধিক প্রচারিত এক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদকীয়তে 'মম' (Maugham) হয়ে যান 'মঘাম'; বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (রাজীব গান্ধী) বলে ফেলেন 'আলবার্ট কামুস' (Albert Camus)। তো কই? হাতে বা ঠোঁটে-জিভে কুষ্ঠ হয়নি তো ঐ সম্পাদকের বা রাষ্ট্রপ্রধানের! তবে আর দাপিয়ে বেড়াতে বাধা কোথায়, এই সব মধ্যমেধার mediocre-দের? দুই-একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, বাঙালী সমাজে অন্ততঃ, সাহিত্যের 'stalwart'-দের জমানা তো বহুকাল আগেই শেষ হয়ে গেছে।

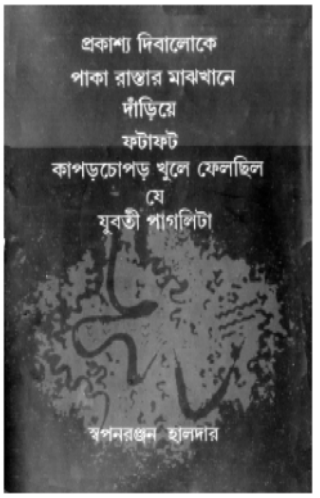

লেখক স্বপনরঞ্জন হালদার প্রণীত, আলোচ্য ১১ খানি না-কাহিনীমূলক রচনার এই 'discourse'-এর সংকলন ... 'প্রকাশ্য দিবালোকে পাকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফটাফট কাপড়চোপড় খুলে ফেলছিল যে যুবতী পাগলিটা' ... যেন আমাদের সমাজ-সংসারের এক আদ্যন্ত এবং ঐকান্তিক নষ্ট হয়ে থাকবার শ্বাসরোধী ক্ষতগুলি দেখাতে দেখাতে স্বয়ং সরস্বতীকে চুম্বন করা; যেন কলম ও কালি দিয়ে সযত্নে তুলে আনা নর্দমার জলে ভেসে যেতে দেখা অব্যবহৃত ভ্রূণদের; যেন নখ-দন্ত-শৃঙ্গ সম কলমের এক সুপরিণত নিয়ন্ত্রকের পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বপ্রক্রীড়া।

বইখানি পড়ে আমার অবস্থা তো বিলকুল 'তথদধ'! মনে পড়ে গেলো পরিচালক 'Q'-র সাম্প্রতিকতম ছবি 'গান্ডু'-র নামভূমিকা-নায়কের সেই উক্তি ঃ ''অ্যাই রিক্সা, এখান থেকে পড়লে মরে যাবো না?'' সত্যিই তো। বামনদের দুনিয়ার আবাসিকদের ১০০ ফুট উঁচুrhododendron-এর মগডালে চড়িয়ে মই কেড়ে নিলে, acrophobia তো বাধবেই। মনে পড়ে গেলো 'দ্রিঘাংচু'-র সেই দাঁড়কাকের 'কঃ'। ''এই যে একটা কাক এসে আমার সভার মধ্যে আওয়াজ করে গোল বাধিয়ে গেলো, এর কারণ কিছু বলতে পারো?'' তবে হ্যাঁ ... ''এই of the mediocre-for the mediocre-by the mediocre বাজারে, কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো বলুন তো মোহায়, এমন একখানি না-অর্ধমনস্ক, আচাভুয়া বই-বোমা হাঁকড়াবার?'' ... হেন প্রশ্ন যদি কেহ শুধোন লেখকেরে, তো তার উত্তরে তিনি সবিনয়ে বলতেই পারেন ঃ ''আজ্ঞে আমি মূর্খ মানুষ, আমি কি অত খবর রাখি, ছেলেবেলা থেকে দ্রিঘাংচু শুনে আসছি, তাই জানি দ্রিঘাংচু যখন রাজার সামনে আসে, তখন তাকে দেখতে দেখায় দাঁড়কাকের মতো। সে যখন সভায় ঢোকে, তখন সিংহাসনের

ডানদিকের থামের ওপর বসে মাথা নিচু করে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, চোখ পাকিয়ে 'কঃ' বলে শব্দ করে। আমি তো আর কিছু জানি না... তবে পণ্ডিতেরা যদি জানেন।" (পণ্ডিতদের) এরপর কি হইলো (হইবে) তাহা শ্যামলাল, ব্রহ্মা, আর সুকুমার রায় বিলক্ষণ জানেন।

আসলে, এ গ্রন্থের empiricism বাস্তবিকই বড়ই উলঙ্গ। যেন কচ্ছপের কামড়, মেঘ না ডাকলে ছাড়ে না! (ডাকলেও ছাড়ে কি?) বস্তুতঃ, স্বপনরঞ্জন একজন বর্ণ empiricist, যিনি বয়স্কদের বিশ্বাসঘাতকতার দুনিয়ায় ঢুকতে নারাজ এক একগুঁয়ে বালকের মতো হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে ... যাঁর এক হাতে কলম, আর অন্য হাতে বিদ্রোহের manifesto। তাঁর এই ১১-টি আগুন প্রমিথিউসের আগুন না হলেও, তা অব্যর্থভাবেই পাঠকের কানে উসকে দেয় মাতৃস্তন্যের জন্য সদ্যোজাত শিশুর আদিম ক্রন্দন।

মনে হতেই পারে, যে এসব কথা sacrilege; কারণ, সদ্যপ্রয়াত সুনীল গাঙ্গুলীরা যতদিন জগন্নাথ, cerebrally দেউলিয়া সমালোচকরাও ততদিন পান্ডা। সন্দীপন যেমন বলেছিলেন, কমোড-কে সিংহাসন ভাবলে যা হয় আর কি! আর এখন তো পুরোপুরি শ্রাদ্ধের আবহাওয়া। তো এই আবহাওয়ায় যে আদিখ্যেতা ২০১২ সনের উত্তরাধুনিক কলকাতা দেখালো, এর সিকির-সিকির-সিকি ভাগও ১৬৬২ তে ফ্রান্সে, কিংবা ১৯৫১-তে অস্ট্রিয়াতে, অথবা ১৯৮৬ তে আর্জেন্টিনায়, দেখা যায় নি মোটেও; এমনকি 'Pensées', বা 'Tractatus Logico-Philosophicus', বা 'Tlön, Uqbar, Orbis Tertius'- এর লেখকদের জন্যও নয়। তার মানে কি তাঁদের তা প্রাপ্য ছিলো না? খুব ছিলো। বরং বহু গুণ বেশী ছিলো। আসলে, সাহিত্যের 'রসিক' ও 'সমঝদার' ও 'বোদ্ধা' জাতি বলে একদা মাননীয় বাঙালী, আজ যে কত দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, এহেন নির্লজ্জতম আচরণ, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁদের সেই কূপমন্ডুকতা প্রসূত দৈন্যকেই সর্বজনসমক্ষে উলঙ্গ করে দেয়। দেশবিদেশের অনেকানেক মহাসাগরের ব্যাপ্তি ও বিস্তার চোখে দেখা তো দূরের কথা, কখনো কানেও শোনেনি যে কুয়োর ব্যাঙেরা, তাদের কাছে তো এমনিভাবেই, আঞ্চলিক নালানর্দমাই সমুদ্রসমান হয়ে ওঠে। নয় কি?

প্রকৃত প্রস্তাবে, একজন জীবিত লেখকের বা স্রষ্টার সমালোচনা করার জন্য মৃত স্রষ্টারা বা লেখকরাই যথেষ্ট। Tarkovsky সারা জীবনে মাত্র ৭ খানি ছবি করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটক ৮ খানি। James Joyce-এর গ্রন্থের সংখ্যাও সাকুল্যে ৭। এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই মহাকালের পরীক্ষায় উৎরে যাবার জন্য যাঁর যাঁর নিজের যে কোনো একখানি কাজই যথেষ্ট ছিলো। বন্ধুবর স্বপনরঞ্জন এখনই সে দিগন্ত ছুঁয়ে ফেলেছেন, এমন মিথ্যে প্রশস্তি আমি মোটেও করছি না। কেননা, নীলোৎপল কলম ধরে কদাচ বন্ধুকৃত্য করে না; কেবল সত্যকৃত্যই করে। তবে তাঁর এ গ্রন্থ, নিঃসন্দেহেই, এক মহাকাব্যিক উড়ানের সূচনাকে চিহ্নিত করে বৈ কি।

তথাপি, লেখকের অস্বস্তিবর্ধক কতিপয় প্রশ্ন রহিয়াই যায়। নিন্দা, সততই, প্রশংসার পূর্বেই করা শ্রেয়।

(এক) ১৭ পৃষ্ঠায় শিরোনামের অব্যবহিত পরেই উদ্ধৃত বক্তব্যটির কথকের নামের বানান যে ভুল লেখা হলো, তা কি নিছকই মুদ্রণপ্রমাদ; না কি বাংলা হরফে লেখা Russian নামের বানান (তারকোভ্স্কি) দেখার ও পড়ার ফলে, 'ভ'-এর তলায় 'হসন্ত'-টি না থাকায়, ভুল উচ্চারণ শেখা ও জানা, এবং তৎপরে ঐ নাম ইংরাজী হরফে লিখতে গিয়ে, 'ভি' (v) এবং 'এস' (s)-এর মাঝখানে একখানি বাড়তি 'ও' (o) এসে যাওয়ার ফাঁদে ধরা পড়ে যাওয়া?

(দুই) ২৯ পৃষ্ঠায় মূল 'পাঠ্য' (text)-এর নবম পংক্তির অন্তিম শব্দটির ক্ষেত্রেও ইংরাজী শব্দ বাংলা বানানে লিখতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটেছে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের phonetics-এর অধ্যাপক প্রয়াত Daniel Jones-এর সর্বমান্য 'Everyman's Pronouncing Dictionary' (পৃষ্ঠা ৪৫২) বলছে, যে 'silhouette' শব্দটিকে উচ্চারণবিধি মতে phonetically ভাঙলে তা দাঁড়ায় ... "si lu:et" অথবা "si luet" ... অর্থাৎ, ইংরাজী বর্ণমালার ২১টি consonant-এর মধ্যে যে ১৫টি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়, সেগুলির মধ্যে এখানে পাই 's', 'l' ও 't'। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট vowel ৩টির মধ্যে ... 'i' উচ্চারিত হবে 'pit'-এর 'i'-এর মতো; 'e' উচ্চারিত হবে 'pet'এর 'e' এর মতো; আর 'u:' ও 'u' হবে যথাক্রমে 'boon'-এর 'oo' এবং 'put'-এর 'u' -এর মতো। সুতরাং সব মিলিয়ে গোটাগুটি উচ্চারণটা দাঁড়াচ্ছে ... 'স্ + ই + ল্ + উ/উ + এ + ট্"= 'সিলুএট' বা 'সিলুয়েট'। অনাবশ্যক একটি 'য'-ফলা ('্য') প্রশ্রয় না পেলে, হেন বাহুল্য-বিভ্রাট নিশ্চিতভাবেই এড়ানো যেতো না কি?

(তিন) ঐ একই পাতার একাদশ পংক্তির ষষ্ঠ শব্দটিতে লেখক বাস্তবিকই 'কূল' রাখতে না পেরে, 'কুল'- ভ্রষ্ট হয়ে, এবং 'কৌলিন্য' খুইয়ে, বিপর্যস্ত হননি কি? যেমনটি আমরা সকলেই জানি, এবং যেমনটি বলা আছে বহুমান্য শ্রী সুবলচন্দ্র চিত্র মহাশয়ের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'-এও, যে (১) 'কুল' অর্থ ... বংশ, বংশীয়, স্বজাতীয়, সমাজ, গোষ্ঠী, সমূহ, গৃহ, দেহ, দেশ, ক্ষেত্র (পৃষ্ঠা ৪০০), এবং (২) 'কূল' অর্থ ... নদ্যাদির তীর, তট, স্তূপ, সৈন্যপৃষ্ঠ, তড়াগ, পুষ্করিণী, আশ্রয় (পৃষ্ঠা ৪০৫)। অধিকতর মন্তব্য নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। তবে, হ্যাঁ! ভাবের ঘরে ডাকাতি করতে চাইলে, লেখক আয়াসহীন হেলায় এটিকে মুদ্রণপ্রমাদ বলে সাফাই গাইতেই পারেন। কোনো হালার কিস্যু কওনের থাগবো না।

(চার) ৪৪ পৃষ্ঠাতেও শিরোনামের অনতিদূরেই মুদ্রিত উদ্ধৃতিটিতে প্রাথমিক শব্দবন্ধ 'where' ও 'ever' যে পৃথক দুটি শব্দরূপে নেত্রসমক্ষে প্রতীয়মান হলো, তাকে কি কোনোভাবেই ছাপার ভুল বলে দায় এড়ানো যায়? কেননা, মাঝের ঐ 'ফাঁক'- খানির দায়িত্ব মুদ্রণ যন্ত্রের ঘাড়ে চাপালে দুটি শব্দ এক হয়ে যা দাঁড়ায়, তাতে আবার পাশাপাশি দুইখানি 'ই' (e) চলে আসে, যাদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক তথা বানানবিধি মতে অশুদ্ধ; যেহেতু প্রকৃত ব্যাকরণসিদ্ধ বানানটি হয় 'wherever'। একে, এমনকী মূল German ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদকের অজ্ঞতা বলেও চালিয়ে দেওয়া যায় না; কারণ সেক্ষেত্রে, আমার পূর্বের বাক্যটির শেষাংশে উল্লিখিত অন্তিম ইংরাজী শব্দটির সঠিক বানান না জেনে তা উদ্ধৃত করা নিতান্তই লেখকের সীমাবদ্ধতা।

(পাঁচ) ৮৪ পৃষ্ঠার অষ্টম লাইনে এসে উপরিউক্ত 'দুই'-এর ভুলটিই ফের একবার চোখে লাগে না কি?

(ছয়) ৮৫ পৃষ্ঠার সপ্তম পংক্তির প্রথম শব্দটিতে পৌঁছে আবারও একবার কেন থম্‌কে দাঁড়াতে হয়? আর এবার প্রশ্ন ওঠে 'সামর্থ' (লেখকের?) নিয়ে! ফের একবার শ্রী সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'-এর ১২৯০ পাতায় উঁকি দিলে দেখা যায়, সেখানে 'সামর্থ্য' আদতেই 'য-ফলা' ('্য') বিহীন নয়। এই স্তরের ত্রুটি একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বস্তুতঃ, বাংলা গদ্যের মহাদিগন্ত এখন বড়ই ফাঁকা। ছোট ও নিচু সে আকাশে এখন কেবলই কেবলই অর্বাচীন কীট-পতঙ্গের পাখনার রোরুদ্যমানতা। আরশোলা, ফড়িং, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, প্রজাপতি, মথ, জোনাকি, ডেঙ্গির মশা ... এদের আর যাই হোক, পাখি তো বলা চলে না কোনোমতেই। তো এই অপ্রয়োজনীয় পোকামাকড়ের ভীড়ে উড্ডীয়মান 'স্বপনরঞ্জন' নামক একলা পাখিটি তাঁর পেশীবহুল লোমশ ডানা মেলে দিন আরো আরো বিস্তৃততম। যথার্থ সম্মান ও প্রকৃত পুরস্কারের ঈপ্সা অগ্রাহ্য করে, উৎসন্নে যাওয়া মূল্যবোধ থেকে উৎকোচ প্রাপ্তি উপেক্ষা করে, তিনি যেন তাঁর কলমের সত্যবদ্ধ অভিমানকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হন আজীবন। দ্রৌপদীর হাঁড়ির মতোই অনিঃশেষ হয়ে উঠুক লেখকের কলম। আমেন!

(২)

"I think, therefore I am. # I am not where I think, and I think where I am not."

[Jacques Lacan]

এই অংশে আমার আলোচনাসাপেক্ষ মাত্র দুটি কিঞ্চিৎকর প্রতিপাদ্য। প্রথমতঃ, কেন এই গ্রন্থটিকে 'discourse'-এর সংকলন বলা যেতে পারে? আর দ্বিতীয়তঃ, সমকালীনতার প্রেক্ষিতে এর প্রাসঙ্গিকতা কতখানি?

তত্ত্বগতভাবে, 'discourse' মানে 'language with a subject or theme'। এটা এর প্রথম বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, 'discourse'-এর মধ্যে একজন (বা একাধিক) বক্তা থাকেন। তিনি (বা তাঁরা) কোনদিকে (বা কোন-কোনদিকে) যাচ্ছেন, সেই দিকে (বা সেই-সেই দিকে) একটা করে অভিমুখ বা তীর থাকে। অর্থাৎ এটি একটি 'vector'। 'It is a vector of speech'। এইখানে, বিষয়টা প্রাঞ্জলতরভাবে বোঝবার জন্য 'course' শব্দটি সবিশেষরূপে স্মর্তব্য। যেমন, সাহেবেরা বলেন, ''এক course-এর dinner''। বা আমরা, অসভ্য কথা উচ্চারণ না করার জন্য ভদ্রলোকের মতো বলি, 'intercourse'। আমার মতে, 'discourse' আর 'intercourse' .... not very far from each other। বরং, স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, যে 'discourse' also is very much a kind of 'intercourse'। 'কথা'-ও, এক ধরনের সঙ্গম বা সন্ধি। এটাকেই আমি ভদ্রভাবে বললাম 'vector'। এখান থেকে আমার inference হলো, 'discourse' is a fact between subject and language; অর্থাৎ 'বিষয়' এবং 'ভাষা'-র মধ্যে সংযোগসাধনকারী সত্য হলো 'discourse'। এখন প্রশ্ন হলো, 'subject' বা 'বিষয়' তো না হয় বোঝা গেলো; কিন্তু 'ভাষা' ('language') কেন? কারণ, একমাত্র 'ভাষা' বা 'language' থেকেই 'speech' বা 'বক্তব্য' আসে। যেমন, কেউ যখন বলে, ''আমি বলি''। এইখানে এসে, Descartes-র আপ্তবাক্যটির ("I think, therefore I am") fallacy- টা প্রথম ধরা পড়ে যায় Lacan-র কাছে। তাই, Descartes - কে শুধরে Lacan লেখেন ...."I am not where I think, and I think where I am not"। ইউরোপের মানুষ মনে করে যে, সে তার বক্তব্যের মালিক; অর্থাৎ "I am the owner of my speech"। কিন্তু বস্তুতঃ এটা একটা illusion; আর এই illusion-এর উপরেই entire European philosophy দাঁড়িয়ে আছে গত সাড়ে তিনশো বছর ধরে। সম্ভবতঃ এটাই, বিগত ৫০ বছরের সবচেয়ে বড় fundamental discovery। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৯৫০ উত্তরকালে, পাশ্চাত্যে যে দার্শনিক আন্দোলন হয়েছে, তার একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ উন্মোচন ছিলো ... "Man is no longer the master of his own house"। মজা হলো, Freud-এর এই কথাখানি Michel Foucault কিছুতেই পুরোপুরি মেনে নিতে পারলেন না; তিনি বললেন .... "enlightenment allows self-critic, auto-critic"। ঠিক এইখানটায় এসে এবার, হেনরূপ উত্তরাধুনিক ফরাসী ভদ্রমহোদয় যুগলের বক্তব্যদ্বয় ঘিরে, একখানি বেশ জাঁদরেল dialectics তৈরী হলো। প্রথমতঃ, Foucault হলেন 'humanism'-এর সমালোচক, কিন্তু তিনি 'enlightenment' কে সংশোধন করে গ্রহণ করতে চান; আর Lacan উভয়কেই বর্জন করতে চান। বস্তুতঃ, Lacan আধুনিক বিজ্ঞানকেই বর্জন করতে চান। তাহলে বিজ্ঞানের জায়গায় যাকে স্থাপন করা হবে, তাকে কি বলা যথাযথ হবে? Lacan বললেন, তাকে বিজ্ঞান না বলাই ভালো; তাকে বরং বলা উচিত 'discourse'। ব্যাপারটা এভাবে ভাবা যেতে পারে, যে Foucault-র 'thesis', আর Lacan-র 'anti-thesis' থেকে গড়ে উঠলো যে 'synthesis', তা-ই হলো প্রকৃত অর্থে 'discourse'।

স্বপনরঞ্জন প্রণীত আলোচনাধীন বর্তমান গ্রন্থটিতে ... ('প্রকাশ্য দিবালোকে পাকা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফটাফট কাপড়চোপড় খুলে ফেলছিল যে যুবতী পাগলিটা') ... উঁকি দিলেও ঠিক একই প্রবণতার সম্প্রসারণ ব্যক্ত হতে দেখা যায়। ''সি ইজ টু-উ মাচ সিডাকটিভ টু বি অ্যাভয়ডেড'' (পৃষ্ঠা ৪০) ... এহেন চরম যে উস্কানিমূলক উচ্চারণের প্রতিক্রিয়াতেই জন্ম নেয় হৃদপিণ্ডে কলম ফুটিয়ে লেখা অভিশপ্ত প্রার্থনার বার্তাবহ নীল এনভেলাপ, এবং যা ফিরে ফিরে আসে আজ লেখকের এই ৫৬ বছরেও, তা যেন যথার্থভাবেই 'মণিময়-আঙুরবালা-মনীষা রায়' কিংবা 'বুঁচির মা-তার খোকাবাবু ঋষভ-ঋষভের বাবা' প্রমুখ অনুভূমিক তথা উল্লম্ব সম্পর্কগুলির প্রত্যেকটির এক-একটি সুনির্দিষ্ট অভিমুখ সমন্বিত 'দ্বান্দ্বিকতার বৃত্ত' ('dialectical gyre' with a pre-defined vector) গড়ে তোলবার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে চলে সযত্নে ... আত্মজৈবনিক তথ্যের সমান্তরালে, এভাবে একাধিক 'পাঠ্য' (text) বিছিয়ে দিয়ে কিছু অভিঘাতময় দ্বন্দ্বমূলক অভিমুখ সৃষ্টির এক অমোঘ উদ্যম ... একাধিক 'vector'। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাঠক, আগের আগের বাক্যটির ঐ সবিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক নির্দিষ্ট শব্দটি, হ্যাঁ, 'আত্মজৈবনিক', যদি আপনি সসতর্কে খেয়াল করতে ভুল না করে থাকেন, তবে আপনি যথার্থই ধরেছেন বটে! আসলে, স্রষ্টা আর তাঁর সৃষ্টির এই সব যাবতীয় চড়াই-উৎরাই-এর মধ্যেই কোথায়-কোথায় যেন, আলগোছে, লেখক আর তাঁর কলমের ঈষৎ আত্মজৈবনিক আঁতাতও আভাসিত হয় বৈ কি; এবং তা হয়, নিছকই একটি বার মাত্র নয় মোটেও! এই গ্রন্থের মলাটদ্বয়ের অন্তর্বর্তী ১১-খানি না - অর্ধমনস্ক সন্দর্ভ নিচয় মধ্যে অন্ততঃ দুইখানির শরীরে ফিরে ফিরে এলো এই আভাস; এবং যদিও তা এলো তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিকতার ছদ্ম-আড়ালেই, তথাপি, আত্মপরিচয় আবডাল করা গেলো কি আদৌ? 'যে নকসি কাঁথাটির বুননে প্রতি বর্গ বিঘতে ছুঁচ ও আঙুলটুপি বদলানো হয়েছিলো' (পৃষ্ঠা ৩৭-৪৩) এবং 'ইণ্ট্রোডাকশন টু অ্যান অটোবায়োগ্রাফি' (পৃষ্ঠা ৭১-৭৭) শীর্ষক 'discourse' দুটিতে যেভাবে 'নীল এনভেলাপ' বা 'নীল ইনল্যান্ড', 'শেষতম' বা 'শেষ চিঠি', 'স্তম্ভিত যুবতী মালতী' বা 'তার চেয়ে ১০ বছরের ছোটো একটি মিষ্টিমিষ্টি মেয়ে', 'বাল্যপ্রেম সোহিনী' বা 'বাল্যবন্ধু মনীষা' যথাক্রমে একে অপরের সম্পূরক হয়ে মুহুর্মুহু পুনরাবর্তিত হলো; এবং সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রূপে যেভাবে পুনরুল্লিখিত হলো 'তিনটি মাত্র শব্দ' কিংবা 'সবুজের জয় হোক' ইত্যাদি শব্দবন্ধসমূহ; তা যে সন্দেহাতীতভাবেই বন্ধুবর লেখক স্বপনরঞ্জনের স্বীয় যৌবনের প্রেমিক সত্তাটির, নিতান্তই ব্যক্তিগত, আত্মজৈবনিক ছাই-হাওয়ার-আশনাই-আলেখ্য উদ্গীরণ, সেই সত্যখানি অবহিত হতে না-অর্ধমনস্ক পাঠক-পাঠিকা সমূহের অধিক সময় ব্যয় হওয়ার কথা নয়! সব মিলিয়ে, একে তবে 'discourse' ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে কি আদৌ?

এইবার দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটিতে আসা যাক। হেথায় অত্যাবশ্যকরূপে স্মর্তব্য, যে, যে কোনো প্রকৃত সাহিত্যকর্মের সমকালীনতার তথা প্রাসঙ্গিকতার ন্যূনতঃ দুইখানি মাত্রা থাকে ... 'বিষয়গত' অর্থাৎ 'thematic contemporaneity' বা 'thematic relevance' এবং 'সাহিত্যমূল্যগত' অর্থাৎ 'literary contemporaneity' বা 'literary relevance'।

প্রথমে 'বিষয়গত' কথা বলি। এর জন্য একটু পুরোনো কাসুন্দি নয়, কাদা, ঘাঁটতেই হবে। 'কলকাতা' নামক, বাংলা ভাষাভাষীদের যে শহরটির জন্ম হয়েছিলো পলাশী যুদ্ধোত্তর সময়ে, এবং যে শহরকে ঘিরেই উত্তরকালে রচিত হয় বাঙালী জাতির নয়া ইতিহাস; সেখানে সেই সময় অসংখ্য 'upstart' বা ভুঁইফোঁড় বড়লোকের উত্থান হয়েছিলো, পরাজিত সিরাজের ধনদৌলত, তথা ইংরেজ প্রভুদের বদান্যতায়। কিন্তু, ছোটলোকের টাকা হলেই যেহেতু সে বড়লোক হয়ে যায় না, ... (কেননা প্রকৃত বড়লোকি আভিজাত্য বা 'pedigree' ভুঁইফোঁড়রা টাকা দিয়ে জোগাড় করতে পারে না) ... সেহেতু, সেই হঠাৎ-হওয়া টাকা ওড়ানোর ক্ষেত্রেও ঐ সব upstart-রা প্রত্যাশিতভাবেই, যৎপরোনাস্তি নিম্নরুচির পরিচয়ই দিয়েছিলো। নিত্য ফাইফরমাশ খাটতে অভ্যস্ত বেয়ারা বা কেরানি, রাতারাতি রাজা-বাদশা বনে গেলে যা হয় আর কি! ১৯৫০-এর আগে পর্য্যন্তও, যে নবকৃষ্ণ দেব ছিলো Governor Drake-এর একজন নকলনবীশ 'মুনশী' (clerk-cum-interpreter) মাত্র, Clive-এর কৃপায় ১৭৬৬-তে সে যখন হয়ে গেলো 'মহারাজা বাহাদুর', তখন যে সে একাধিক রক্ষিতা পালবে, এতে আর আশ্চর্য্য কী। (আমরা, মানে মূর্খ, ইতিহাসজ্ঞানশূন্য ও অর্ধশিক্ষিত উত্তরাধুনিক বাঙালীরা অবশ্য এখনও পিত্যেক বছর দুগ্গাপুজোর

সময় সপরিবারে-সবান্ধবে শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো লাইন দিয়ে দেখতে যাই, এবং নিজেদের দুর্দান্ত ঐতিহ্যবোধে নিজেরাই আপ্লুত হয়ে আত্মশ্লাঘার উদ্‌গার তুলতে তুলতে বলি, ''আহা, কি আভিজাত্য!'' বেচারী মীরজাফর একাই 'বিশ্বাসঘাতক' গালি খায়!) রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ জগন্নাথ কুশারীও ছিলো দিনমজুর। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে, টিকটিকির বা চামচিকের ভূমিকা সার্থকভাবে পালন করার পুরস্কার হিসেবে তারাও জমিদারি পায়। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথের ৪৩ খানি বেশ্যালয় ছিলো এই কলিকাতাতেই। (এ প্রসঙ্গে আর অধিক কথা না বলাই শ্রেয়!) জোড়োসাঁকো এলাকাটি সেই সময় পরিচিত ছিলো 'Black Town' নামে, আর কলকাতায় সাদা সাহেবদের আবাসস্থল ছিলো 'White Town' এবং এই 'Black Town' ছিলো তৎকালীন কলকাতার দেহব্যবসার মূল কেন্দ্র। রাতারাতি মুহুরী থেকে জমিদার বনে যাওয়া এহেন বহু বাবুদের অনেকানেক রাঁড় পোষার কারণেই গড়ে উঠেছিলো সোনাগাছি (আসলে 'সোনাগাজি')। পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো সভ্যতার মতোই এই সোনাগাছিও সেই সময় ছিলো বৃহত্তর বাঙালী সমাজের একটি ক্ষুদ্রতর অংশ। কিন্তু আজ, ২০১৩ সালে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যবস্থাটা যেন ... (নিছকই একটু বদলে যাওয়া নয়) ... আপাদমস্তক উল্টে গেছে! অর্থাৎ, বর্তমানে, গোটা বাঙালী সমাজটাই, তার নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ অংশ বাদ দিয়ে, পুরোপুরি সোনাগাছি হয়ে উঠেছে! মানে, এখন, তথাকথিত ভদ্রলোকের বাঙালী সমাজ, হয়ে পড়েছে বৃহত্তর সোনাগাছির একটি ক্ষুদ্রতর অংশ।

বস্তুতঃ, স্বপনরঞ্জন প্রণীত, আলোচ্য এই 'discourse'-এর সংকলনে, একবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের অনুরূপ এক চিত্রই মূর্ত্ত হয়। যাবতীয় সম্পর্ক সমূহের হেন বৈধতা অথবা অবৈধতার সমান্তরাল সমাপতনে, মন্দ লয়ে এক-এক করে বেড়ে ওঠে যে বহুবিধ শারীরিক ও মানসিক ত্রিভুজগুলি ... তাদের এক-একটি বাহু রূপে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের প্রতিষ্ঠিত করে চলেন লেখক, নিজের অক্লান্ত সুনিপুণ কলমের আঁচড়ে আঁচড়ে। কখনো তা ধরা পড়ে 'ও হুজুর' -এর (পৃষ্ঠা ৪৯-৫৭) 'ইপ্সিতা-সুমন্ত-অরিজিত' ত্রয়ীর রসায়নে, কখনো 'ঝুমকা গিরা রে/বেরিলি কা বাজার মে...'-র (পৃষ্ঠা ৫৮-৬৫) 'সাবিত্রী-মদন-বাবলু' ত্রয়ীর সম্পর্কে, আবার কখনো বা 'দীনময়ী, সিমন দ্য বভোয়া ও পবিত্রর বউ'-এর (পৃষ্ঠা ৬৬-৭০) 'পবিত্রর বউ-নাড়ু মল্লিক-পবিত্র সূত্রধর' ত্রিভুজের কাঠামোয়। অসহায় আমরা বুঝতে আরম্ভ করি, যে ধীরে ধীরে 'সোনাগাছি' এগিয়ে আসছে, এসেছে, গেরস্থ বাড়ির অন্দরমহলের পানে ... ঢুকে পড়ছে, পড়েছে, মধ্যবিত্ত মানুষের শোয়ার বিছানা পার করে দাম্পত্যের নৈতিকতায় ফাটল ধরতে থাকা, ভগ্নমান ইঁটের দেওয়ালের ফাঁকে-ফোকরে ... হাঁ গরাসে আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছে, নিয়েছে, আমাদের সংসার এবং আমাদের উত্তরসূরীদের ভবিষ্যৎ। একবিংশ শতাব্দীতে, আজ আমাদের ঘরে-ঘরে গড়ে উঠেছে 'সোনাগাছি'! 'বিষয়গত' সমকালীনতার তথা প্রাসঙ্গিকতার, এর চেয়ে বড় আবিষ্কার, বোধ হয়, এই সময় আর হয় না। এরই সমান্তরালে আবার, পান্তাভাতে কাঁচা পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কা পোড়ার মতো, শেষোক্ত ত্রিভুজ-কাঠামোয় বাড়তি মাত্রা যোগায় সার্ত্র-সিমন এবং বিদ্যাসাগর-দীনময়ী দম্পতি যুগলের সম্পর্কের টানাপোড়েন ... পাশ্চাত্য তথা প্রাচ্য দাম্পত্যের জোড়-বিজোড়ের এহেন ঢেউ আয়াসহীন হেলায় খেলিয়ে দিতে থাকেন স্বপনবাবু, বারংবার, তাঁর এই 'discourse'-এর সংকলনের পরতে পরতে।

এবার আসা যাক 'সহিত্যমূল্যগত' আলোচনায়। স্বপনরঞ্জনের এই গ্রন্থখানি পড়তে থাকাকালীন, এবং তৎপরে পাঠ-উত্তরকালীন, মুহুর্মুহু যা আমাকে তাড়িত করেছে, ও এখন এই সমালোচনাটি গড়ে তোলবার সময়েও নিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, তা হয় 'সময়'। সময়ের এহেন 'তাড়া', 'সমকালীনতা'-র পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তর 'প্রাসঙ্গিক'; অথবা, লেখা যেতেই পারে, 'প্রাসঙ্গিকতা'-র প্রেক্ষাপটে প্রভূত 'সমকালীন'। Bergson-এর 'duration' আর 'duree'-র সুতো টেনে ধরে ভাবতে গিয়ে যখন দেখি, ... যে এই গ্রন্থের চরিত্রগুলি তাঁদের বহির্জগতের বহমান জীবনের উল্টোপিঠে, স্বীয় আভ্যন্তরীণ জীবনের অন্দরমহলে, প্রতিনিয়তই নিজেদের বিছিয়ে দিচ্ছে, নিজেরা ছড়িয়ে পড়ছে, অতীত-অভিজ্ঞতার তথা ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার মানস-স্রোতে; এবং তাঁরা বদলে যাচ্ছে বারবার; যখন যে পরিবেশের সম্মুখীন তাঁদের হতে হচ্ছে, যখন যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছে, তখন, সেই অনুযায়ী, তাঁরা প্রতিবারই মেলে ধরছে যে যাঁর নিজের এক ভিন্নতর মুখ, ... তখন অনুভব করি, যে এ তো ঐ 'Bergsonian time'-এর ধারণারই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়োগ তথা প্রতিফলন। 'সময়'-এর এই ধারণাকেই একেবারে উত্তর-উত্তরাধুনিকতম জমিতে দাঁড়িয়ে ভেবেছেন এই গ্রন্থের লেখক; যা অতি অনিবার্যভাবেই মনে করিয়ে দেয়, এই নতুন শতকে জন্ম নেওয়া (২০০৬-এ) সর্বপ্রথম, এবং অতি অবশ্যই প্রধানতম (the first major literary theory of criticism flourished in the 21st century) তত্ত্বটির কথা ... 'Hauntology' .... যেটি নিঃসন্দেহে তথা প্রশ্নাতীতভাবে, একবিংশ শতাব্দীর এতাবৎ পেরোনো মাত্র ১২/১৩-টি বৎসরের মধ্যে গড়ে ওঠা গুটিকতকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমও বটে।

'Hauntology'-র ধারণা প্রথম বিবৃত করেন Jacques Derrida তাঁর ১৯৯৩-তে প্রকাশিত 'Spectres of Marx'-এ। মূল শব্দটি আদতে একটি 'portmanteau word', যা গড়ে উঠেছে 'haunt' এবং 'ology' শব্দদ্বয়ের যৌথতায়, যেটি আবার Derrida-র মাতৃভাষা ফরাসীর একটি শব্দ 'ontology' -র homophone, বা 'প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ'। খুব সহজভাবে বললে 'Hauntology' একটি অবস্থাকে ব্যক্ত করে ....'the paradoxical state of the spectre, which is neither being nor non-being'; কিংবা University of East Anglia -র Emeritus Professor Colin Devis যাকে বলেছেন "the priority of being and presence with the figure of the ghost as that which is neither present, nor absent, neither dead nor alive"। বস্তুতঃ ১৮৪৮-এ Marx Engels 'communism' -এর 'ভূত' -এর কথা ("A spectre is haunting Europe, the spectre of Communism") বলেছিলেন, এবং এর প্রায় ১৫০ বছর পরে ১৯৯৩-এ Derrida তারই প্রতিধ্বনিতে যে Marx-এর 'ভূত' -এর কথা ("Marxism would haunt Western society from beyond the grave") তুললেন, একবিংশ শতকের প্রারম্ভে ২০০৬-এ এসে তা-ই যেন হয়ে উঠলো 'সময়ের ভূত' বা 'zeitgeist'। এবং সবিশেষরূপে লক্ষ্যনীয়, যে যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে 'communism'-এর 'ভূত' তাড়া করেছিলো ইউরোপকে, আর বিংশ শতাব্দীতে কবর থেকে উঠে এসে স্বয়ং Marx-এর 'ভূত' তাড়া করেছিলো আমেরিকাকে, এখন এই একুশ শতকে 'সময়ের ভূত' কিন্তু তাড়া করে ফিরছে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষকে। স্বপনরঞ্জনের সৃষ্ট চরিত্রগুলিও এই একই 'সময়ের ভূত'-এর তাড়ায় নিদারুণভাবে আক্রান্ত; ঠিক যেভাবে আক্রান্ত লেখক স্বয়ং, এবং এমনকি ৮৬-তম পৃষ্ঠার 'ঋণপত্র'-এ হাজিরা দেওয়া তাঁর তাবৎ পূর্বসূরী তথা সমকালীন সকলেও। বস্তুতঃ, এই 'zeitgeist' থেকে রেহাই মেলেনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তথা বাদল সরকার তথা Jean Francois Millet হয়ে, সুবিমল মিশ্র পর্য্যন্ত কারোরই।

'Zero Books' প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ 'Ghosts of My Life'-এর লেখক Mark Fisher যেমন মনে করেন, যে 'Hauntology' হলো প্রকৃতপক্ষে ''একটি নির্দিষ্ট 'সাংস্কৃতিক সময়'-এর প্রতিফলন'' ... (the manifestation of a specific 'cultural moment') .... সংস্কৃতির বহুল ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের প্রতিটিরই এক অথবা একাধিক করে 'hauntological' মাত্রা (dimension) আছে। বস্তুতঃ, যেমনটি Freud বলেছিলেন ১৯৩৭-এ, তাঁর 'Moses and Monotheism' -এ, যে আমাদের সমাজও গড়ে উঠেছে একটি 'hauntological' ভিত-এর উপর দাঁড়িয়ে ... "the voice of the

dead father"; সেই সাপেক্ষে ভাবলে যে কোনো ও সমস্ত সৃষ্টিশীল পরিবেশনার রূপই নিদারুণ 'ভৌতিকভাবে সময়তাড়িত' বা 'hauntological' -এর এই ধারণাকেই আরো খানিক প্রসারিততর করে তাঁর ১৯৭৩-এর গ্রন্থ 'The Anxiety of Influence : A Theory of Poetry'-তে, Harold Bloom লিখলেন 'anxiety of influence' -এর তত্ত্ব। অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রতিটি সৃষ্টিই 'haunted হয়, যেহেতু প্রত্যেক উত্তরসূরী লেখক তাঁর পূর্বসূরী লেখকদের সঙ্গে এক 'Oedipal relation'-এ বাঁধা; অতঃপর, পূর্বসূরীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, তাঁদেরকে ১০০ শতাংশ অস্বীকার করে, তাঁদের লেখাপত্র পুরোপুরি ভুলে গিয়ে, নতুন কোনো সৃষ্টি করা কোনো উত্তরসূরীর পক্ষেই বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু মজা হলো, প্রত্যেকেই, সচেতনে এবং অবচেতনে, এই বাধা প্রাণপণে উৎরে যেতে চায়, এই অদম্য আকাঙ্খায়, যাতে করে কি না, সে স্বয়ং, তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে, নিজের গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তুলতে পারে। এখন, যাঁরা পূর্বসূরীদের লেখাপত্রের এই 'admiration-&-intimation to rejection-&-displacement to deforming-&-recasting'- এর সুদীর্ঘ যাত্রাপথের বহুবিধ ফাঁদগুলিতে পড়েও দিব্যি উত্তরণের পথ খুঁজে নিতে পারেন তাঁদের নিজস্ব প্রতিভায় ভর করে, মহাকালের কবিসভায় কেবল তাঁদেরই পরিচয় অক্ষয় হয়ে রয়ে যায় ...(Bloom অবশ্য আরো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন 'clinamen', 'tessera', 'kenosis', 'daemonization', 'askeses' এবং 'apophrades' নামক ছয়খানি পদ্ধতির, যেগুলির সাহায্যে এই উত্তরণ সম্ভব) ... আর যাঁদের 'mediocrity' হেন গোলকধাঁধা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে অক্ষম, তাঁদের নাম যে নিশ্চিতভাবেই কাটা পড়ে যায় সময়ের রোলকলের খাতা থেকে, এ তো এমনকি মুন্নি-শীলা-বিপাশা-আনারকলি-জেলেবীবাই-রাও জানে।

সেই অর্থে, অতএব, প্রতিটি লেখাই 'hauntological'। প্রকৃত প্রস্তাবে, সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের মূল ঐতিহ্যগত ভিত্তিই হলো 'notion of posterity', যাকে Paul Eluard সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন "harsh desire to endure" বলে। এখন, এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে, নিরন্তর 'সময়ের ভূত'-এর তাড়া খেয়ে ফিরতে থাকা একজন লেখকের কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হয় এই, যে, লেখক হিসেবে সে স্বয়ং, এমন একটি 'সময়'-এর ফসল, যে 'সময়' বাস্তবিকই বড়ই বিড়ম্বিত, যে 'সময়' হয় Hamlet-এর সমকালীন ডেনমার্ক-এর মতোই "seriously out of joint"; সুতরাং, তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিতেও সেই 'সময়' প্রতিফলিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ, 'hauntology' তত্ত্বের মূল বক্তব্যও তাই-ই, যে বর্তমান সময়ে, 'সংস্কৃতি' তার গতিবেগ ও অভিমুখ হারিয়েছে, এবং এমতাবস্থায়, আমরা দাঁড়িয়ে আছি ইতিহাসের এক পালাবদলের কালে, যখন নব-নবতর প্রযুক্তি 'স্থান' ও 'কাল'-এর চিরন্তন ঐতিহ্যগত ধারণাসমূহকে প্রতিনিয়ত মুহুর্মুহু বদলে দিচ্ছে, 'facebook' আর 'twitter' আর 'orkut' গুলিয়ে দিচ্ছে 'virtual' ও 'real' -এর ফারাক। এহেন এক মহা-অস্থির সময়ে, একমাত্র একজন প্রকৃত লেখকই পারেন একথা যথাযথভাবে স্বয়ং বুঝতে এবং তৎপরে তাঁর লেখার মাধ্যমে সকলকে বোঝাতে, যে এই উন্মাদনা আদতেই অপ্রকৃতিস্থতাজনিত নয়, বরং পূর্বউদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথা সুপরিকল্পিত ... 'সংস্কৃতি'-কে এভাবে তার গতিবেগ ও অভিমুখ হারিয়ে ফেলতে দেবার এই প্ররোচনা, (যা প্রকৃত প্রস্তাবে হয় 'cultural imperialism'), গভীর অভিসন্ধিমূলক, এবং সেই কারণেই, আর সকলে একে আপাতদর্শনে যতই পাগলামি বলে মনে করুক না কেন, একজন প্রকৃত লেখককে Polonius -এর মতোই, সঠিকভাবে বুঝে নিতেই হবে, যে "though this be madness, yet there is method in it"; আর ঠিক সেইভাবেই, সেই 'methodical madness' প্রতিফলিত হতে হবে তাঁর লেখাতেও।

বস্তুতঃ, '২৪ ঘন্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা'-র (পৃষ্ঠা ২২-২৮) সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগের করণিক পান্নালাল মজুমদার থেকে শুরু করে 'কমরেড অজামিল তলাপাত্রর দিনক্ষণ এখন যেভাবে'-র (পৃষ্ঠা ১৭-২১) তরুবালা, অজামিল, ও তাঁর দামড়া ভাই; কিংবা 'একটি গ্রামীণ পরচর্চা কেন্দ্রে অগ্ন্যুৎপাত ও শিলাবৃষ্টি জনিত ক্ষয়ক্ষতি, যতটুকু যা জানা গেছে'-র (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৮) বউটা, লোকটা, আর চটসুন্দরী; অথবা 'বিলিভ মি, যাহা বলিব সত্য বলিব'-র (পৃষ্ঠা ৭৮-৮৪) অমলকান্তি, আমানকাকা, আর মা ... এঁদের সকলের কথোপকথনে, তথা তৎজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত রসায়নের প্রতিফলনেhigh-voltage ধারাবিবরণী নাগাড়ে সম্প্রচার করে চলেন স্বপনরঞ্জন, তাঁর গ্রন্থের ৯ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা জুড়ে, তাতে পূর্বোল্লিখিত ঐ 'সময়ের তাড়া' আর ঐ 'methodical madness' .... উভয়ই যারপরনাই মুন্সীয়ানার জলছাপ সমেত মালুম হয় বৈ কি! তাঁর এই গ্রন্থখানি যে সদর্থেই একখানি সার্থক 'hauntological text' হয়ে উঠতে পেরেছে, তা যে তাঁর সমসাময়িক 'specific cultural moment' -কে সফলভাবে 'manifest' করতে পেরেছে, সে কথা সবচেয়ে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে দেয় ঐ ৮৬-তম পৃষ্ঠার 'ঋণপত্র'-টিই; যা হয়ে উঠেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর গ্রন্থের 'hauntological base, তাঁর লেখক সত্তার 'anxiety of influence'-এর প্রতিফলন, 'the voices of his dead fathers'।

লেখকের কেরামতির আরেক ধরনের ঝলসানি যা সবিশেষ দ্রষ্টব্য, তা হয় তাঁর এই 'discourse'-গুলির কোনো-কোনোটির অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে চোরাস্রোতের মতো আচম্বিতে সরাসরি চলচ্চিত্রের দৃশ্য-সংলাপ বইয়ে দেওয়া ... অবশ্যই প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে, চিত্রনাট্যের এই হুবহু খণ্ডদৃশ্য সঞ্চালনা বাস্তবিকই তাঁর 'পাঠ্য' (text)-গুলিতে এক অনন্য মাত্রা আরোপিত করে। 'ও হুজুর'-এ চলচ্চিত্র 'এক ছোটি সি লাভ স্টোরি'-র মনীষার আদিত্যকে স্বমেহন করতে প্ররোচিত করার দৃশ্য-সংলাপ (পৃষ্ঠা ৫৪), কিংবা 'ঝুমকা গিরা রে/বেরিলি কা বাজার মে ...'-তে 'ব্যান্ডিট কুইন'-এর বিক্রম আর ফুলন-এর মৈথুন-উত্তর দৃশ্য-সংলাপ (পৃষ্ঠা ৬৫) ... লেখকের হেন কাপ্তেনিকেই প্রত্যয়িত করে বটে। তবে পাশাপাশি এও সর্বৈব সত্য, যে 'অ্যাম্বুল্যান্স সংক্রামক ব্যাধির জন্য নহে'-তে টেলিফিল্ম 'পিকু'-র দৃশ্য-সংলাপটির (পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬) ব্যবহার তথা প্রয়োগ অপ্রাসঙ্গিক কিংবা খাপছাড়া বলে মনে না হলেও, অবশ্যই তা কৃত্রিমভাবে আরোপিত বা চাপিয়ে-দেওয়া, এবং এমনকি কিয়দংশে অকিঞ্চিৎকর হঠাৎ-গুঁজে-দেওয়া বলেও মনে হয় বৈ কি! এবং ঠিক এমনটিই মনে হয়, ঐ 'ও হুজুর'-এরই ৫৬ পৃষ্ঠার প্রথম পরিচ্ছদটি পড়তে পড়তেও, যেখানে '২৩ জুলাই, ২০০৫'-এর সংবাদপত্র থেকে 'কাট' করা অংশটির এহেন ব্যবহার বড়ই জোলো, আর একই সঙ্গে বড়ই Cliched বলে মনে হয়, এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটির নিরিখে অন্ততঃ। অর্থাৎ, লন্ডন পুলিশের গাফিলতি প্রসূত এমন একটি 'মানবিক ট্র্যাজেডি'-র অভিঘাতময়তা বোধ করি আরো বহুলাংশে প্রাঞ্জলতর করে ফুটিয়ে তোলা যেতো নিশ্চিতভাবেই, যদি এস্থলে লেখক তাঁর বিবেচনাধীনে ব্যবহার করতেন, ঐ নির্দিষ্ট বাস্তব ঘটনাটির ভিত্তিতে নির্মিত, 'জগ মুন্দ্রা' পরিচালিত হিন্দি চলচ্চিত্র 'শুট অন সাইট'-এর এক বা একাধিক প্রাসঙ্গিক দৃশ্য-সংলাপ, ও/বা চলচ্চিত্রের প্রারম্ভে খুবই কিঞ্চিৎকর অর্থবহ তথ্য-ফলকনামাটি ঃ "Six months after 9/11 London Ploice put in place a 'SHOOT ON SIGHT' Policy codenamed 'Operation Kratos' to deal with suspected suicide bombers. This policy was activated after the 7/7 bombings in London."

বুদ্ধদেব-বাবু চোরেদের মন্ত্রীসভায় থাকবেন না বলে ইস্তফা দেওয়ার পর, তাঁকে উৎসর্গ করে ১৯৯৫ সালে লেখা সন্দীপনের সেই অনবদ্য গল্প 'এক যে ছিল দেওয়াল'-এর অন্তিমতম বাক্যে দেখা গিয়েছিলো, যে রাতারাতি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া সাদা দেওয়ালটার ইঁট, চুন ও সুরকির এক অনুচ্চ ধ্বংসস্তূপপাদমূলে একটি গর্বিত গাঁইতি পোঁদ উঁচু করে বসে আছে। সন্দীপনের ঐ অনুপম উপমান ও উপমেয়-দের প্রতি-তুলনা টেনে, স্বপনরঞ্জনের এই গ্রন্থের একটি সম্যক মূল্যায়নে, লেখা যেতেই পারে, যে সমকালীন বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমশঃ ধ্বসে যেতে থাকা পাঁচিলটির, ''মিড্‌লক্লাস-প্রেগনেন্ট-মহিলাদের-

দ্বিপ্রাহরিক-ঘুমের-ট্যাবলেট-তুল্য-গল্প-উপন্যাস'' ইত্যাদির সুউচ্চ ধ্বংসস্তূপপাদমূলে একটি গর্বিত শাবলের মতোই পোঁদ উঁচু করে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে পেরেছে বটে এই গ্রন্থখানি। হ্যাঁ, স্বপনবাবু ... না হোক ততটা মজবুত, কিংবা হোক না আনাড়ির মতোই, অথবা পল্লবগ্রাহিতার জংজর্জর ... তথাপি ... অন্যদিক থেকে, উল্টোদিক থেকে, সামর্থ্য অনুযায়ী শাবলটাকে আপনি বেশ ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন পুরোনো গাঁথনির ভেতর ... আর হ্যাঁ, নিছকই এক মুঠো জীর্ণ চুনবালি ঝরানোই নয় ... আপনি ইঁটও খসিয়েছেন বৈ কি! বস্তুতঃ, লেখক স্বপনরঞ্জনের সমকালীন বঙ্গদেশখানি যে আজ বাস্তবিকই বড়ই বিড়ম্বিত, প্রকৃত অর্থেই তা যে এখন Hamlet-এর সমসাময়িক ডেনমার্ক-এর মতোই , "seriously out of joint", সে কথাটি তাঁর এই গ্রন্থখানি থেকে বেশ বোধগম্য হয়। সে অর্থে, এটি নিশ্চিতভাবে একটি সার্থক 'token of time' তো বটেই।

১৯১৭-য় Lenin কে লিখিতভাবে "a cold-blooded trickster who spares neither the honour nor the life of the proletariat" আখ্যা দেওয়া, অথচ ১৯৩৩-এ Stalin-এর কাছে হাত পেতে 'Order of Lenin' নেওয়া, বিচিত্র মহান লেখক Maxim Gorky, যখন নিজের জন্মস্থান Nizhnii Novgorod-এ.. (১৯৩২ সালে Stalin-এর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে সেখানে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্তও, 'Decree of October 22, 1990, Article 1' জারি হওয়ার আগে অবধি, যে শহরের নাম বদলে দিয়ে তাঁরই নামে রাখা হয়েছিলো 'Gorky') .... সাধারণ মানুষের জন্য "people's theatre" গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন, তখন ১৯০৩ সালের ২-রা নভেম্বর, Nemirovich-Danchenko-কে লেখা একটি চিঠিতে Chekhov বলেন ঃ "Apropos of the popular theatre and popular literature ... all that is foolishness, sugar candy for the people. You must not lower Gogol to the people, but raise the people to the level of Gogol." বন্ধুবর স্বপনরঞ্জন ঠিক ঐ শেষের বাক্যটিতে বলা কাজটিই করবার চেষ্টা করে চলেছেন নিরলসতম সততার সাথে। সাধু! সাধু!

প্রকাশক : ডানা ৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম ৬০ টাকা।

চি ঠি প ত্র

বইমেলা ২০১৩ সংখ্যাটি আমার কাছে এক প্রাপ্তি হয়ে এসেছে। এত যত্ন আর গুরুত্ব দিয়ে 'মানবিক সমাজের দিকে' বইটির আলোচনা ছেপেছেন— এটাই প্রাপ্তি। প্রাপ্তি এ কারণে যে, এর আগে অধিকারী দু'একজন বইটির আলোচনা না-করেই বইটি ফেরৎ দিয়েছেন—এমন কথা জানা ছিল, এ ক্ষেত্রে যে তা ঘটেনি—এটাই আমার কাছে এক প্রাপ্তিবোধ জাগিয়ে তুলেছে। এই সুযোগে আলোচক শ্রদ্ধেয় শম্ভু ভট্টাচার্য মহাশয়কেও ধন্যবাদ!

দ্বিতীয়ত, 'উল্টোদূরবীন' তার জন্মলগ্ন থেকেই এক অন্যরকম সাহিত্যের মুখপত্র। প্রতিটি সংখ্যাই স্বতন্ত্র। এ সংখ্যাটিও তার ব্যতিক্রম নয় কিন্তু 'অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি' না-থাকায় সংখ্যাটি অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই মনে হওয়াটা কেবল এই জন্য নয় যে, 'অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি' অঘোষিত ভাবে পত্রিকার 'সম্পাদকীয়' হয়ে ওঠে, এ সংখ্যায় কোনও 'সম্পাদকীয়' নেই বলে! তার চেয়ে বেশি কোনও তাৎপর্য আছে, এমনটাই মনে হয়েছে আমার। 'অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি' — কথাটার মধ্যেই আছে প্রতিস্পর্ধাকে জাহির করার প্রস্তাবনা, ব্যাখ্যা করার পরিসর যা নতুন 'বয়ান' তৈরি করে দেয়। বিশেষত যা 'কর্পোরেট সাহিত্য'এর বাইরে থাকা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে তুলে ধরে। আপাত স্থিতাবস্থার মধ্যে এক আন্দোলনকে উপলব্ধি করা যায়।

'উল্টো দূরবীন' এ জন্য স্বতন্ত্র। 'অবাধ্য ক্রিয়াপদগুলি'-র প্রকাশ ছাড়া 'উল্টো দূরবীন' তার স্বতন্ত্রতা হারাবে—এটা যেন না-হয়!

মণ্ডলপাড়া, পোঃ মতুয়াধাম, বনগাঁ — সুরঞ্জন প্রামাণিক

'উল্টো দূরবীন' কি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে? 'পাতিরাম'-এ সব সময় পাই না কেন? প্লিজ, কাগজটা রেগুলার বের করুন। আমার মতো অনেকেই তৃষ্ণার্ত উটের মতো এই মরূদ্যানটির দিকে তাকিয়ে থাকে, আমার বিশ্বাস। বাই দি বাই, বহুদিন ব্যতিক্রমী সাক্ষাৎকার পাচ্ছি না কেন? আর যে কথাটা না বল্লেই নয়, 'উল্টো দূরবীন' যেন শুধুমাত্র কবিতার কাগজ না হয়ে যায়, দেখবেন!

ঘোষপাড়া, কালনা, বর্ধমান — মিতা রায় ব্যানার্জি

আপনাদের পত্রিকায়, সুরঞ্জন প্রামাণিকের লেখা *'নারী-পুরুষের যৌথ অভিযান মানবিক সমাজের দিকে'* — বইটির রিভিউ পড়লাম, লিখেছেন শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য। বলাইবাহুল্য, শ্রী ভট্টাচার্যের লেখাটি আমার ভালো লেগেছে। শুধু তাই নয়, নিজেকে সমৃদ্ধ করতেও সমর্থ হয়েছি। শ্রী ভট্টাচার্য লিখেছেন, মূল লেখাটিতে দাসপ্রথা, সমাজে নারীর অবস্থান এবং আরও বেশি ইতিহাস-এর রেফারেন্স থাকা উচিত ছিল। আমার মতে, মূল লেখার সঙ্গে উক্ত বিষয়গুলি খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। এবং একাধিক বিষয়ের অবতারণা করে মূল লেখার ভার বাড়ানোর প্রয়োজন অবান্তর। তবে, মূল লেখার ব্যাখ্যা আর একটু বেশি হলে বোধহয় খুব কিছু ক্ষতি হতো না। শ্রী ভট্টাচার্য'র মতে, সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে 'মার্ক্সীয় দর্শনে'। এবং শুধুমাত্র বিবেকের উপর নির্ভরশীল থাকা যায় না। এই দুটি কথার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয়, তাই এই চিঠির অবতারণা।

আমার মতে, মানব-মানবী জীবনের কোন্ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিবার গঠন করবে বা করবে না বা ভিন্নপথে এগোবে তা নির্ভর করবে সেই দু'জন নর-নারীর বোধের উপর। মানুষ বোধের উপর ভিত্তি করে, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি, শিক্ষা। মিলেমিশে বিবেক (হয়তো অনেকেই বলবেন সকলের বিবেক থাকে না, হয়তো তাই) জাগ্রত হয়, বিবেকই মানুষকে চালনা করে, চিন্তা করতে, সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। সুতরাং বিবেককে অস্বীকার করা তো যায়ই না বরং নির্ভর করতেই হয়। এই বিবেক কিছুটা পরিবর্তন বা পরিশীলিত করতে সক্ষম রবিঠাকুর, বিদ্যাসাগর বা রামমোহন রায়—এঁদের লেখা বা চিন্তা-ভাবনা বা কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে কোন নারী-পুরুষ তাঁদের ব্যক্তিগত পরিবার গঠন বা জীবনযাত্রা পাল্টাতে সক্ষম নয়, সক্ষম সামাজিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গিয়ে যা তার যোগ্যতায় সম্ভব, তারা সে পথেই এগোতে বাধ্য। কোন মহান পুরুষের আপ্তবাক্য সবক্ষেত্রে মেনে চলা যে সম্ভব নয়, সে কথায় বোধহয় শ্রী ভট্টাচার্য আমার সঙ্গে সহমত হবেন। আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমির পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সময়ের চাহিদাকে মেনে নিতে মানুষ বাধ্য।

কোন নিরক্ষর মানুষ (নারী-পুরুষ) প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবার গঠন করে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই তার জীবনে সমস্যাও আসে। তাঁর মার্ক্সীয় দর্শন বা অন্য কোন দর্শনের জ্ঞান ছাড়াই তাঁকে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বিবেক যন্ত্রণার উপর নির্ভর করে সেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয়। কখনও সমাধানের পথ পেয়ে যান, কখনও বা অসমর্থ হন। আমরা যারা মার্ক্সীয় দর্শনের উপর নির্ভরশীল বা আস্থাশীল তারাও মাঝে মধ্যেই বেশ কিছু সমস্যার সমাধান না করতে পেরে সমস্যা বয়ে নিয়ে বেড়াই। সুতরাং, উক্ত সমস্যার সমাধান শুধু মার্ক্সীয় দর্শনের উপর নির্ভরশীল নয়।

উক্ত সমস্যার সমাধান যদি শুধুমাত্র মার্ক্সীয় দর্শন দিতে পারতো তবে বোধহয় সুরঞ্জন প্রামাণিকের গাঁটের কড়ি খরচা করে বইটা লিখতে হতো না। তবে লেখাটি বর্তমান সমাজে ভীষণ প্রয়োজনীয় চিন্তার খোরাক যোগান দিতে সক্ষম বলে আমার বিশ্বাস।

খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা — রাখী দে

‘বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি ছাড়া কাব্যের আরেকটা দিক আছে সে তার শিল্পকলা’।— রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ এই কথা নিয়ে আমরা কতটা ভেবেছি? পদ্য থেকে কবিতায় উত্তরণের ক্ষেত্রে এই ‘শিল্পকলা’-র ভূমিকাই বা কতটুকু? কবিতার এরকম নানা জরুরি বিষয় নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

রমেন আচার্যর

কবিতার শিল্পকলা

একই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে

রমেন আচার্যর

কবিতা সংগ্রহ

প্রাপ্তিস্থান ধ্যানবিন্দু কলেজ স্কোয়ার কলকাতা

প্রকাশিত হতে চলেছে

২০০৬ — ২০১২ পর্যন্ত সমাজ—রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত সতেরটি প্রবন্ধের সংকলন।

মানবিক রাজনীতির ধারণা

সুরঞ্জন প্রামাণিক

উবুদশ

২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন,

কলকাতা-১২

প্রকাশিত হয়েছে

বুদ্ধিজীবী, রাজনীতি ও সমসময় সম্পর্কিত ১৭ বছরের লেখা ১৭টি প্রবন্ধের একটি সময়ানুগ সংকলন

সামাজিক আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবী

অশোক চট্টোপাধ্যায়

দাম ৭৫ টাকা

চর্যা প্রকাশনী

কাঁপা, কাঁচড়া পাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রাপ্তিস্থান

বুকমার্ক, ধ্যানবিন্দু, পিবিএস

নাবিকীয় জীবন সমুদ্রে, অনন্ত ঢেউয়ের শীর্ষে কিংবা গভীর তলদেশে প্রিয়তর নারীর হৃদয়কে দেখা। উত্তাল ঝঞ্ঝায়—রৌদ্রে পালতোলা রূপময়, নোনা মাস্তুলের শির-দাঁড়ায় সময়ের উত্থান পতনের দায়ভার নিয়ে *সমুদ্রতান্ত্রিক*-এর যেখানে পংক্তি শেষ সেখান থেকে শুরু *নোনা জলের কবিতা*

নোনা জলের কবিতা

জলধি হালদার

গাঙচিল

৪এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

৩০ এর দশক থেকে ২০১১ পর্যন্ত সময়কালের ১৯৫ জন কবিকে নিয়ে **শম্ভু ভট্টাচার্যের** লেখা কবিতা বিষয়ক অপ্রাতিষ্ঠানিক গদ্যের অনন্য দ্বিতীয় সংস্করণ

মানব সম্পর্কের কবিতা

শম্ভু ভট্টাচার্য

এডুকেশন সেন্টার

১৫সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান ধ্যানবিন্দু কলেজ স্কোয়ার কলকাতা

বিশ্বনাথ গরাই মানেই ধান্যবীজ, বৃষ্টিজলকে শব্দেগেঁথে ভুবনকে করে তোলে অন্নপূর্ণাময়, চাষাজীবনের ক্ষত তার আটপৌড়ে পদাবলী। আগের বইগুলি *কৃষিসমাচার* থেকে *আলো জল শস্যগান* আমরাতো পড়েছি। *অপেক্ষার পল অনুপলে* আলো আঁধারের মধ্যে প্রেমের পুনরাবিস্কার কিংবা আসন্ন প্রলয়ের মধ্যেও খুঁজে পাই আলোর সংকেত।

অপেক্ষার পল অনুপলে

বিশ্বনাথ গরাই

পত্রলেখা ১০বি কলোজ রো, কলকাতা-৯

পরিবেশ চেতন আণবিক চর্চার বিরোধী শহর তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে একা বেরিয়ে পরা নিষাদ পথিক যা ছিল কিংশুক মন্ডলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আমাদের পাখিগ্রাম*-এ। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ঘূর্ণি ও পলির প্রবাহে* কবির পর্যটকসত্তা এবং কৃষকবেশ ফসলের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে প্রেমের সুক্ত বীজের আঁধারে।

ঘূর্ণি ও পলির প্রবাহ

কিংশুক মন্ডল

প্রাপ্তিস্থান : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা

মানবের সম-অধিকারই বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি। মানবাধিকারের সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যা এখনো সংস্কৃতিগত চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি, সাম্প্রতিক বর্বরতার চিহ্নগুলি দেখলেই তা স্পষ্ট। এই প্রেক্ষাপটে সমাজচিন্তকরা যে ধারণা পোষণ করেন তার নিবন্ধ সংকলন ঃ

মানবাধিকার চর্চা

সুরঞ্জন প্রামাণিক সম্পাদিত

পরিবেশক ঃ বুক মার্ক

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা

সম্প্রতি প্রকাশিত

নির্বাচিত কবিতা

অমিত চক্রবর্তী

সংগ্রহ করতে চাইলে কলেজ স্কোয়ারে ‘ধ্যানবিন্দু’ তে খোঁজ করুন

সম্পাদক ঃ অমিত চক্রবর্তী স্বপন হালদার

Contact : G-6, Rabindra Palli, Block-A, 3rd Floor, Swapnalaya Apartment. Baguiati (Jora Mandir), Kolkata 700 059

Website : ultodrubin.wordpress.com Email :ultodurbin@gmail.com Phone : 9836587612 (M), 033-25708184 (R)

Published by Radha Chakraborty from the above address & printed by her from Cameo Pvt. Ltd, 140 Arabinda Sarani, Kol-6